PARUL HISTORY

সিরাজের পুত্র ও বংশধরদের সন্ধানে

BanglaBook.org

অমলেন্দু দে

পলাশির যুদ্ধে হারিয়ে যাওয়া কয়েকটি তথ্যের অনুসন্ধানে দীর্ঘকাল ব্যাপৃত ছিলেন অধ্যাপক অমলেন্দু দে।

এই যুদ্ধ সংক্রান্ত ভারতীয় ও বিদেশি লেখকদের মূল্যবান গ্রন্থসমূহ এবং সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত নথিপত্রেও সেগুলির সন্ধান না-পাওয়ায় তিনি আঠারো শতকের পারিবারিক কাগজপত্র অনুসন্ধান করতে থাকেন। অধ্যাপক দে বিশেষ নজর দেন সেইসব জমিদার পরিবারের নথিপত্রে, যাঁরা ১৭৫৭ কিংবা ১৭৫৮ খ্রিস্টাব্দে দত্তক পুত্র গ্রহণ করেছিলেন।

ময়মনসিংহের জমিদার পরিবারের সঙ্গে বাংলার নবাবদের সুসম্পর্ক ছিল। অধ্যাপক দে *ময়মনসিংহের ইতিহাস* গ্রন্থে এমন কিছু তথ্য পান, যার সূত্র ধরে তিনি খোঁজ পেয়ে যান ইতিহাসে অনুল্লেখিত সিরাজ উদ্‌দৌলার পুত্রের!

সিরাজের সন্তান এই জমিদার পরিবারেই দত্তক পুত্র হিসেবে গৃহীত হয়েছিলেন। সিরাজের অন্যতম সেনানায়ক মোহনলাল ছিলেন সিরাজের স্ত্রী আলেয়ার দাদা। ধর্মান্তরিত হওয়ার আগে আলেয়ার নাম ছিল হীরা। সিরাজ ও হীরার এই পুত্রকে নিয়ে মোহনলাল যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ২৩ জুন (১৭৫৭ খ্রি.) পালিয়ে চলে যান ময়মনসিংহে। তারপর সেখানকার জমিদার পরিবারে ব্যবস্থা করেন তাঁর আপন ভাগিনেয়কে দত্তক নেওয়ার। এই দত্তক পুত্রের নাম হল যুগলকিশোর রায়চৌধুরী।

যেভাবে একের পর এক নবলব্ধ তথ্যের সাহায্যে সিরাজের পুত্র ও বংশধরদের অজানা ইতিহাস এ গ্রন্থে উন্মোচিত হয়েছে, তা এককথায় অনবদ্য। প্রসঙ্গত, মোহনলাল সম্পর্কে অধ্যাপক দে যেসব অজানা তথ্য সংগ্রহ করেছেন, তার ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য।

সব মিলিয়ে, পলাশির যুদ্ধের ইতিহাস ও তাৎপর্য আলোচনায় এই গ্রন্থ এক মহামূল্যবান সংযোজন।

www.BanglaBook.org

কে যুগলকিশোর?

ময়মনসিংহের দোর্দণ্ডপ্রতাপ হিন্দু জমিদার?

নাকি, তাঁর ধমনীতে বইছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এমন এক নবাবি-বংশের খুন—প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে যা জন্ম দেবে নানা উপকথার?

থ্রিলারের থেকেও রোমাঞ্চকর পলাশির যুদ্ধ-পরবর্তী সেই অজানা ইতিহাস।

www.BanglaBook.org

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও রূপায়ণ
শিবেন্দু সরকার

Parul Prakashani Pvt Ltd
ISBN 978-93-82300-47-2
9 789382 300472
₹ 150.00

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ড. অমলেন্দু দে-র জন্ম ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ২ জানুয়ারি।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভারতীয় ইতিহাসের গুরুনানক অধ্যাপক হিসেবে অবসর গ্রহণের পরও অশীতিপর এই মানুষটি নানা গবেষণাকর্মে ব্যাপৃত।

অষ্টাদশ, ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর বাংলা তথা ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ইতিহাস ড. দে-র বিস্তৃত গবেষণার ক্ষেত্র। ভারতীয় নবজাগরণের চরিত্র এবং হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের প্রকৃতি পুনরাবিষ্কৃত হয়েছে তাঁর লেখায়। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন, বিশেষত ভারতের জাতীয় বৈপ্লবিক আন্দোলনে (১৮৭৬-১৯৪৭) শ্রীঅরবিন্দের ভূমিকা সম্পর্কে তিনি আলোকপাত করেছেন সম্পূর্ণ নতুনভাবে। ধর্ম এবং রাজনীতি প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধির ভাবনা নিয়েও তিনি আমাদের ভাবিয়েছেন ভিন্ন মার্গে।

ইতালীয় ও জাপানি ভাষায় অনূদিত হয়েছে তাঁর একাধিক ইংরেজি ও বাংলা গবেষণাপত্র। এশিয়াটিক সোসাইটির প্রাক্তন সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক, অধ্যাপক দে সম্প্রতি পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তাঁর *Theological Discourses in Indian History* এবং *Religious and Cultural Pluralism : In Indian Historical Context*-এর মাধ্যমে। ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর *History of the Khaksar Movement in India (1931-1947)* Vols. I & II বরেণ্য ইতিহাসবিদদের প্রশংসা ও অভিনন্দন অর্জন করেছে।

সিরাজের পুত্র ও বংশধরদের সন্ধানে

সিরাজের পুত্র ও বংশধরদের সন্ধানে

অমলেন্দু দে

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

পা রু ল

পা রু ল
পারুল প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড
৮/৩ চিন্তামণি দাস লেন কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রথম সংস্করণ ২০১২

© অমলেন্দু দে ২০১২

প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনো অংশের কোনো ধরনেরই
প্রতিলিপি অথবা পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত
অমান্য করা হলে উপযুক্ত আইনি
ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

অন্য কোনোরকম বাঁধাই বা প্রচ্ছদে এই বইটি কোনো ব্যক্তি অন্য
কোনো ব্যক্তিকে দিতে পারবেন না এবং বইটির অন্য
কোনো গ্রহীতার ক্ষেত্রেও তাঁকে
এই একই শর্ত আরোপ
করতে হবে।

ISBN 978 93 82300 47 2

বর্ণ সংস্থাপন পারুল প্রকাশনী
আই প্রেস ৩০এ ক্যানাল ইস্ট রোড কলকাতা ৭০০ ০১১ থেকে মুদ্রিত

১৫০.০০

অমিত ও তাপ্তীকে

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

ভূ মি কা

আমি পলাশির যুদ্ধের ইতিহাস লিখিনি। এই বিষয়ে বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ব্রিটিশ ও ভারতীয় ঐতিহাসিকরা লিখেছেন। ফারসি ভাষাতেও প্রমাণ্য গ্রন্থ রয়েছে। এই বিষয়ে স্যার যদুনাথ সরকার চমৎকার আলোচনা করেছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থপঞ্জি খুবই মূল্যবান। ইতিহাসবিদরা বিভিন্ন দেশের আর্কাইভস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে এই যুদ্ধের ওপর আলোকপাত করেছেন। সেই সময়ের সমাজজীবনের প্রেক্ষাপটেও গ্রন্থ রচিত হয়েছে। আমি এই পুস্তিকায় পলাশি যুদ্ধের কয়েকটি তথ্যের অনুসন্ধান করেছি মাত্র। দীর্ঘকাল ধরে আমার মনে কয়েকটি প্রশ্ন ছিল। তার যথার্থ উত্তর এই সব মূল্যবান প্রকাশিত গ্রন্থে পাইনি। তাই আমার অনুসন্ধান ভিন্ন প্রকৃতির ছিল। তারই কথা সিরাজউদ্‌দৌলার পুত্র ও বংশধরদের সন্ধানে নামক গ্রন্থে আলোচনা করেছি।

প্রধানত তিনটি আঠারো শতকের পারিবারিক কাগজপত্র থেকে যেসব তথ্য আমি সংগ্রহ করতে পেরেছি তাতে দীর্ঘকাল ধরে লালিত আমার প্রশ্নসমূহ অনুসন্ধানে খুবই সহায়ক হয়। এই পারিবারিক কাগজপত্র খুবই মূল্যবান। সেই সময়ের সমাজজীবন আলোচনাতেও গুরুত্বপূর্ণ। ময়মনসিংহের বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ জমিদার পরিবারের ইতিহাস আলোচনা করলে অনেক মূল্যবান তথ্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়। নানা কিংবদন্তীও এই পরিবার সম্পর্কে পাওয়া যায়। এই পরিবারের পূর্বপুরুষ পারস্য ভাষা শিক্ষা করবার জন্য খুবই যত্নবান ছিলেন। তাঁরা এই ভাষা শিখে বাংলার নবাব সরকারে দায়িত্ব পালন করে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। তাঁরা সংস্কৃত, বাংলা ও পারস্য ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করে বাংলার

নবাবদের আমলে তাঁদের সহায়তা লাভ করে প্রভূত ভূসম্পত্তির অধিকারী হন। ময়মনসিংহের বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ জমিদার পরিবারের উত্থান সম্পর্কে অনেক তথ্যই *ময়মনসিংহের ইতিহাস* গ্রন্থে পাওয়া যায়। সুসঙ্গ রাজবংশ, মুক্তাগাছার জমিদার বংশ ও অন্যান্য প্রাচীন ব্রাহ্মণ জমিদার বংশের ইতিবৃত্ত সম্পর্কে অনেক তথ্যই এই গ্রন্থে রয়েছে। তাছাড়া দুটি মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল গিরিন্দ্র মোহিনী দাসী সম্পাদিত *জাহ্নবী* পত্রিকায় (১৩১৫) এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত *ভারতী* পত্রিকায় (১৩১৬)। লালা অজয় কুমার দে বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগার থেকে এই দুটি প্রবন্ধ সংগ্রহ করে দেওয়ায় আমি ময়মনসিংহের জমিদারি সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য পেয়েছি। এই পুস্তিকার পরিশিষ্ট অংশে এই দুটি প্রবন্ধই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই তথ্য আমার অনুসন্ধানে খুবই কাজে লেগেছে। গৌরীপুরের বিখ্যাত জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর উৎসাহ ও সাহায্যেই *ময়মনসিংহের ইতিহাস* গ্রন্থ রচিত হয়েছে। পলাশি যুদ্ধের সময়কালের ইতিহাস আলোচনায় এই জমিদার পরিবারের তথ্যসমূহ খুবই মূল্যবান। ঔপনিবেশিক আমলে গৌরীপুর জমিদার পরিবারের যে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামের ঐতিহ্য পরিলক্ষিত হয় তা থেকেই অনুমান করা যায়, কেন সিরাজউদ্‌দৌলার একমাত্র পুত্র এই পরিবারে পলাশির যুদ্ধের পরে আশ্রয় পেয়েছিল। তখন সিরাজ পুত্রের বয়স ছিল ছয় বছর। সে সব কথা আমি এই গ্রন্থে আলোচনা করেছি।

দ্বিতীয়ত আর একটি পরিবারে সুরক্ষিত বিস্তৃত তথ্য পলাশি যুদ্ধের হারিয়ে যাওয়া তথ্যের অনুসন্ধান করতে খুবই সাহায্য করেছে। এই পরিবারের পদবী হল লালা দে। ভারতে আর একটিও লালা দে পরিবার নেই। লালা পদবী আছে, কিন্তু লালা দে পদবী নেই। এই পরিবারের যিনি দীর্ঘকাল ধরে পারিবারিক তথ্য সমূহ সযত্নে সংরক্ষণ করেন তাঁর নাম হল লালা বিজয়কুমার দে। তিনি ছিলেন শিলং-এর বিখ্যাত উকিল। তাঁর বাড়িতে বহু ফারসি গ্রন্থ ছিল। তিনি নিজেও ফারসি ভাষায় দক্ষ ছিলেন। তিনি সিলেটে জন্মগ্রহণ করেন। পরে শিলং চলে যান নতুন পদবী নিয়ে। তাঁর বংশধররা এই পদবী গ্রহণ করেন। তিনি মারা যাবার পূর্বে পরিবারের ইতিহাস তাঁর আদরের নাতি লালা অজয়কুমার দে-কে দিয়ে যান এবং এই তথ্য গোপন করার নির্দেশ দেন। পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তির ফটোও তাঁকে দেন। তিনি তাঁর দাদুর বাড়িতে বহু ফারসি বই দেখেছিলেন। দাদুর কাছে একান্ত গোপনে যখন শোনেন তাঁরা হলেন সিরাজউদ্‌দৌলার পুত্রের প্রত্যক্ষ

BanglaBook.org

বংশধর, তখন তিনি খুবই বিস্মিত হয়েছিলেন। পলাশির যুদ্ধে সিরাজের পরাজয়ের পরে তাঁর পুত্রের আপন মামা মোহনলাল তাকে নিয়ে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জুন যুদ্ধে বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে পালিয়ে চলে যান ময়মনসিংহে। ছয় বছরের সিরাজ পুত্রকে ময়মনসিংহের জমিদার পরিবারে দত্তক রাখার ব্যবস্থা করে মোহনলাল ছদ্মবেশে উত্তরবঙ্গে চলে যান। তাঁকে ও সিরাজ পুত্রকে ধরবার জন্য মীরজাফর ও ইংরেজ কোম্পানির গুপ্তচর বাহিনী হন্যে হয়ে চেষ্টা করেছিল। সিরাজ পুত্রের নাম হয় যুগলকিশোর রায়চৌধুরী। তাঁর আদি নাম কী তা জানা যায় না।

অনেক বছর আগে পড়েছিলাম *মুর্শিদাবাদ কাহিনী* গ্রন্থে নিখিল নাথ রায় মোহনলালের বোনকে আলেয়া নামে উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর বোন তো ধর্মান্তরিত হওয়ার পর আলেয়া নামে পরিচিত হন। তাহলে তাঁর আগের নাম কী ছিল? লালা দে পরিবারের তথ্য থেকে জানতে পারি তাঁর নাম ছিল মাধবী, আদর করে পরিবারের সবাই তাঁকে হীরা বলে ডাকতেন। লালা অজয়কুমার দে প্রথমে এই তথ্যটি আমাকে দেন। তিনি হীরার একটি ছবিও আমাকে পাঠান। তারপর লালা দে পরিবারের আরও যাঁরা আমাকে তথ্য দিয়ে সাহায্য করেন তাঁদের তথ্যেও এর সমর্থন পাই। তাঁরা হলেন অজয় রায়চৌধুরী, লাল বিজন দে এবং লালা শ্যামল দে। তাঁরা যে দীর্ঘ প্রবন্ধটি আমাকে পাঠান তাঁর শিরোনাম ছিল 'Heera's Legacy' এবং এইসব সূত্র থেকে আরও জানতে পারি হীরার গর্ভে সিরাজের একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। পরে ইসলামের রীতি অনুযায়ী তাঁদের বিবাহ হয়। সিরাজ, হীরা ও তাঁর পুত্রকেই যথেষ্ট সমাদরে রাজপ্রাসাদেই রাখেন। কীভাবে আলিবর্দি তাঁদের বিবাহ দেন তা এই পুস্তিকায় আমি আলোচনা করেছি। লালা বিজন কুমার দে *My Recollection of Family Tales* শিরোনামে যে নিবন্ধটি পাঠান তাতে আমি অনেক মূল্যবান তথ্য পেয়েছি। রাজা রবিশঙ্কর দে কিছু তথ্য পাঠিয়ে আমাকে সাহায্য করেন।

লালা অজয়কুমার দে রক্ষিত পারিবারিক তথ্য থেকে জানা যায়, যুগলকিশোর রায়চৌধুরী ময়মনসিংহের জমিদারি ত্যাগ করে সিলেটে জমিদারি কিনে বসবাস করতে থাকেন। সেখানে যুগলকিশোরের সঙ্গে তাঁর পুত্র প্রাণকৃষ্ণনাথ রায়চৌধুরী থাকতেন। প্রাণকৃষ্ণনাথের পুত্র শৌরীন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী দুবার নাম পরিবর্তন করেন, যাতে ভারতে ব্রিটিশ প্রশাসকরা তাঁদের প্রকৃত পরিচয় না জানতে পারেন। শৌরীন্দ্রকিশোর তাঁর পিতার কাছ থেকে তাঁদের পরিবারের প্রকৃত ইতিহাস পান।

BanglaBook.org

প্রাণকৃষ্ণনাথ পুত্রকে এই কথাও বলেন, তাঁর পিতা যুগলকিশোর রায়চৌধুরী ছিলেন সিরাজউদ্‌দৌলা ও হীরার (আলেয়া) পুত্র। সেইজন্য গোপনে সিলেটের কাজলশা জমিদারিতে যুগলকিশোর মারা যাবার পর তাঁকে যেন কবর দেওয়া হয়। এটা প্রাণকৃষ্ণনাথের কাছে তাঁর নির্দেশ ছিল।

প্রাণকৃষ্ণনাথ তাঁর পুত্রকে উচ্চশিক্ষার জন্য কলকাতা পাঠান। তখন শৌরীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী প্রসন্নচন্দ্র রায়চৌধুরী নামে হিন্দু কলেজে ভর্তি হন এবং সেখান থেকে বি.এ. ডিগ্রি যখন পান তখন হিন্দু কলেজ প্রেসিডেন্সি কলেজে রূপান্তরিত হয়। তিনি হিন্দু কলেজের ছাত্র হিসেবে ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে জুনিয়র স্কলারশিপ পান। লালা অজয়কুমার দে Presidency College Register থেকে যে তথ্য সংগ্রহ করে আমাকে এনে দেন তার পুরোটাই এই পুস্তিকার পরিশিষ্ট অংশে মুদ্রিত করেছি। তা থেকে জানা যাবে, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র ছিলেন। তাঁর সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের পরিচয় ছিল কিনা সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য সংগ্রহ করতে পারিনি। তবে একসময়ে প্রসন্নচন্দ্র রায়চৌধুরীকে সিলেটের কাজলশা জমিদারি ত্যাগ করে সুনামগঞ্জে জমিদারি কিনে প্রসন্নকুমার দে নামে আত্মগোপন করে থাকতে হয়। প্রসন্নকুমার দে খুবই প্রতিভাবান ছিলেন। তিনি ইংরেজিতে কবিতা লিখতেন। তাঁর দুটি কবিতা সম্প্রতি আমেরিকায় একটি গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। প্রসন্ন কুমার রচিত কবিতা গ্রন্থে একটি কবিতা আছে, তাঁর শিরোনাম হল: 'Is Bankim Dead?' তা পড়ে আমার মনে হয়েছে তিনি বঙ্কিমের প্রতি খুবই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। লালা দে পরিবারের তথ্যে এই কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, বঙ্কিমচন্দ্রের *দেবী চৌধুরাণী* উপন্যাসের ভবানী পাঠক হলেন মোহনলাল। এই সংবাদটি আমার মনে কৌতূহল সৃষ্টি করায় বিস্তৃত করে যদুনাথ সরকার ও আরও কয়েকজন লেখকের মতামত আলোচনা উল্লেখ করেছি।

লালা দে পরিবারের সূত্রে এমন তথ্যও পেয়েছি, যা আমাকে খুবই বিস্মিত করে। লালা বিষ্ণু দে-র কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে লালা অজয়কুমার দে যে কাগজপত্র পাঠান তাতে জানতে পারি, প্রসন্নকুমার দে-র পুত্র শরদিন্দু ছাত্র অবস্থাতেই বিপ্লবী আন্দোলনে যোগদান করেন। পরে মহাত্মা গান্ধী পরিচালিত অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষা অসমাপ্ত রেখেই আন্দোলনে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েন। তিনি কমিউনিস্ট পার্টিতে এমন সময়ে যোগদান করেন যখন কমিউনিস্ট সদস্যরাও কংগ্রেসের সদস্য হিসেবে

BanglaBook.org

থাকতে পারতেন। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে যাবার পর শরদিন্দু কমিউনিস্ট পার্টিতে থেকে যান। তাঁর স্ত্রী সুষমা পুরকায়স্থ শ্রীহট্ট জেলার নানকার আন্দোলনের নেত্রী ছিলেন। তিনিও কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর তাঁরা দুজনেই আত্মগোপন করে পার্টির কাজ পরিচালনা করেন। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁদের দুজনকেই পাকিস্তান সরকার গ্রেফতার করে। তারপর দীর্ঘ বাইশ বছর তাঁদের কখনো কারাগারে অথবা আত্মগোপন করে পার্টির কাজ করতে হয়। অবশেষে ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে মুক্ত হয়ে ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে তাঁরা ভারতে আসেন। কেউ জানতে পারেনি সিরাজউদ্‌দৌলার এক প্রত্যক্ষ বংশধর বিপ্লবী আন্দোলনে, মহাত্মা গান্ধী পরিচালিত আন্দোলনে ও কমিউনিস্ট আন্দোলনে জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলি অতিবাহিত করেছেন। আমি শরদিন্দু দে ও সুষমা পুরকায়স্থের ফটো সংগ্রহ করে এই পুস্তিকায় মুদ্রিত করেছি।

এইভাবে সিরাজের বংশধরদের সন্ধান লালা দে পরিবারের পুরোনো কাগজপত্র থেকে সংগ্রহ করতে পেরেছি। অবশ্য প্রথম থেকেই লালা অজয়কুমার দে সাহায্য করতে এগিয়ে না আসলে আমার পক্ষে সিরাজের বংশধরদের সন্ধান পাওয়া সম্ভব হত না। লালা দে পরিবারের যাঁরা আমাকে সাহায্য করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি আমি গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। পরিশিষ্ট অংশে এই পরিবারের যে বংশতালিকা দিয়েছি তাতেই সিরাজের বংশধরদের সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব হবে। এই পরিবারের প্রসন্নচন্দ্র রায়চৌধুরী ও লালা বিজয়কুমার দে-র ছবি পাঠিয়ে লালা অজয়কুমার দে আমার পুস্তিকার গুরুত্ব যথেষ্ট বৃদ্ধি করেছেন। এই লালা দে পরিবারের কয়েকজন হিন্দুবৃত্তের বাইরে মুসলমান ও খ্রিস্টান পরিবারের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। পরিবারের সকলের সঙ্গেই সুসম্পর্ক থাকায় তাঁদের প্রসারিত মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

তৃতীয়ত যাদব মহাসভার কাগজপত্র থেকে যেসব মূল্যবান তথ্য আমি সংগ্রহ করতে পেরেছি তার কথা আমি বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই। তা থেকেই নিশ্চিত হতে পেরেছি মোহনলাল পলাশির যুদ্ধে নিহত হননি। নদীয়ার যাদব ও পূর্ণিয়ার লাল বংশের পারিবারিক কাগজপত্র আমার খুবই কাজে লেগেছে। যাদব সম্প্রদায়ের বর্তমান নেতা ডা. স্বপন কুমার ঘোষ আমাকে তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন। তিনি একজন চিকিৎসক এবং যাদব সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য নানা সামাজিক কাজে যুক্ত। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচিত হবার সুযোগ করে দিয়েছেন

BanglaBook.org

বিপ্লবতীর্থ চট্টগ্রাম স্মৃতি সংস্থার শহিদ সূর্য সেন ভবনের সম্পাদক শ্রী অরূপ রায়। আমি মোহনলাল সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করছি, এই খবর পেয়ে শ্রী অরূপ রায় একদিন ড. স্বপন কুমার ঘোষকে আমার বাড়িতে নিয়ে আসেন। ড. ঘোষকে আমি বুঝিয়ে বলি, দীর্ঘকাল ধরে আমি সিরাজের বংশধর ও মোহনলালের সন্ধান করতে চেষ্টা করছি। সিরাজের বংশধরদের সন্ধান পেলেও, মোহনলালের কোনো খোঁজ পাইনি। মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, হুগলি, বর্ধমান প্রভৃতি জেলায় ঘুরে বেড়িয়েছি তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। নানা জায়গায় নানা লোকের সঙ্গে কথা বলে মনে হয়েছে, মোহনলাল পলাশির যুদ্ধে নিহত হননি। গুপ্তিপাড়ায় তাঁর নামে ফলকও দেখেছি। মোহনলালের নামে নানা কাহিনি ছড়িয়ে আছে। এখন আমি অসুস্থ হয়ে বাড়িতেই আবদ্ধ হয়ে আছি। কোথাও যেতে পারি না। আমার অবস্থা দেখে ডা. স্বপন কুমার ঘোষ সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দেন। কিছুদিন পরে এসে তাঁর কাছে সংরক্ষিত পারিবারিক কাগজপত্র দিয়ে যান। তারপর থেকে আমার কাছে এসে প্রকাশিত প্রবন্ধ ও যেসব ছবি তিনি ক্যামেরাবন্দি করেছেন তা আমাকে ব্যবহারের জন্য দিয়ে যান। তাঁর সাহায্য না পেলে আমার পক্ষে মোহনলালের বংশধরদের সম্পর্কে সুস্পষ্ট করে লেখা সম্ভব হত না। তাছাড়া *মুর্শিদাবাদ কাহিনী* গ্রন্থ থেকে মোহনলাল সম্পর্কে যে সব তথ্য পেয়েছি তা আমি এই পুস্তিকায় উল্লেখ করেছি। যাদব সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনও মোহনলাল সম্পর্কে যে গর্বের ভাব রয়েছে তা লক্ষণীয়।

সুতরাং তিনটি পরিবারের কাগজপত্র থেকে সিরাজউদ্‌দৌলা, হীরা (আলেয়া), তাঁদের পুত্র ও বংশধরদের সন্ধান বহুদিনের চেষ্টায় উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছি। মোহনলাল সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট করে খবর সংগ্রহ করতে না পারলেও তিনি যে পলাশির যুদ্ধে নিহত হননি সে সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছি। অবশেষে গ্রন্থটি লেখা শেষ করতে পারায় অসুস্থ শরীর সত্ত্বেও গভীর আনন্দ লাভ করতে পেরেছি।

এই গ্রন্থটি প্রকাশের পূর্বেই আমার গবেষণার কাজের সংবাদ পেয়ে *হিন্দুস্তান টাইমস* দৈনিক পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার শ্রীমতী মউ চক্রবর্তী উদ্যোগী হয়ে যেভাবে এই বহুল প্রচারিত পত্রিকায় প্রথম পাতায় বড়ো করে 'Siraj descendants are alive and kicking' শিরোনামে সংবাদ পরিবেশন করেছেন (৯ জুন, ২০১২) তাতে ভয়ানক বিস্মিত হয়েছি। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না। তিনি ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারের বিষয়ে সংবাদ সংগ্রহের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের

BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

উপাচার্য অধ্যাপক সুরঞ্জন দাশের কাছে আমার নাম ও বাড়ির ঠিকানা পান। একদিন ফোন করে ক্যামেরাম্যান নিয়ে এ বিষয়ে সংবাদ সংগ্রহের জন্য তিনি হাজির হন। আমার গ্রন্থাগারের ছবি তুলে *হিন্দুস্তান টাইমস* পত্রিকায় (২৪ এপ্রিল, ২০১২) দ্বিতীয় পাতায় খুব বড়ো করে সংবাদ পরিবেশন করেন। তখন তিনি আমার গবেষণার বিষয় শুনে গিয়েছিলেন। তিনি পরে আমাকে ফোন করে আরও তথ্য সংগ্রহ করেন।

যাঁরা আমার ভাবনাকে রূপ দিতে সাহায্য করেছেন তাঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। এই গ্রন্থ নিয়ে আলোচনা হলে আমি যে খুশি হব তা বলাই বাহুল্য।

কলকাতা
১০ আগস্ট, ২০১২

অমলেন্দু দে

সূ চি

ভূমিকা ৭

সিরাজের পুত্র ও বংশধরদের পরিচয় ১৭

মোহনলাল ৩৫

পরিশিষ্ট ৬১

পরিচিতি ৭৩

চি ত্র সূ চি

আলিবর্দি খাঁ, সিরাজউদ্‌দৌলা, হীরা (আলেয়া), মিরজাফর ও তার পুত্র মিরন, লর্ড রবার্ট ক্লাইভ, জেমস রেনেল কৃত ম্যাপ, খোশবাগ, 'খোশবাগ' সমাধি ক্ষেত্রের মসজিদ, নবাব সিরাজউদ্‌দৌলার সমাধির সামনে মাথার কাছে ফলক, ফলকসহ নবাব সিরাজউদ্‌দৌলার সমাধি, সিরাজউদ্‌দৌলার সমাধির পূর্বদিকে ভাই আক্রাম উদ্‌দৌলার সমাধি, হীরার (আলেয়া) সমাধি, নদিয়া জেলার জুড়ানপুরের সতীপীঠের শিবমন্দির, জুড়ানপুর সতীপীঠের পাতালগৃহের প্রবেশ পথের গেট, জুড়ানপুরে মহারাজা মোহনলালের কনিষ্ঠপুত্র হুক্কালালের বংশধরদের বাসগৃহের ধ্বংসাবশেষ যেখানে মহারাজা মোহনলালের জ্যেষ্ঠপুত্র রাজা শ্রীমন্তলালের শেষ বংশধর রাজা পৃথ্বিচাঁদ লাল এসেছিলেন ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে, হুগলির গুপ্তিপাড়ার রাস্তার ধারে মোহনলাল স্মৃতিস্তম্ভ, গুপ্তিপাড়া—ভগবানচন্দ্র মঠের সবচেয়ে প্রাচীন চৈতন্য মন্দির—এখানেই মোহনলাল পলাতক ছিলেন, গুপ্তিপাড়া—ভগবানচন্দ্র মঠের দ্বিতীয় বৃন্দাবনচন্দ্র মন্দির—এখানেই মোহনলাল সন্ন্যাসী হিসেবে পলাতক ছিলেন, নদিয়ার জুড়ানপুর সতীপীঠের বটবৃক্ষের বাঁধানো বেদী—পূজাস্থল, শৌরীন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, লালা বিজয়কুমার দে, শরদিন্দু দে ও তাঁর স্ত্রী সুষমা (পুরকায়স্থ) দে, লালা বিজন দে—ডানদিকে ছোটো ছেলে হানুট দে, বাঁদিকে স্ত্রী ও বড়ো ছেলে আটিয়ার দে, বীরেন দে—অশ্বারোহী

আলিবর্দি খাঁ

সিরাজউদ্‌দৌলা

হীরা (আলেয়া)

মিরজাফর ও তার পুত্র মিরন

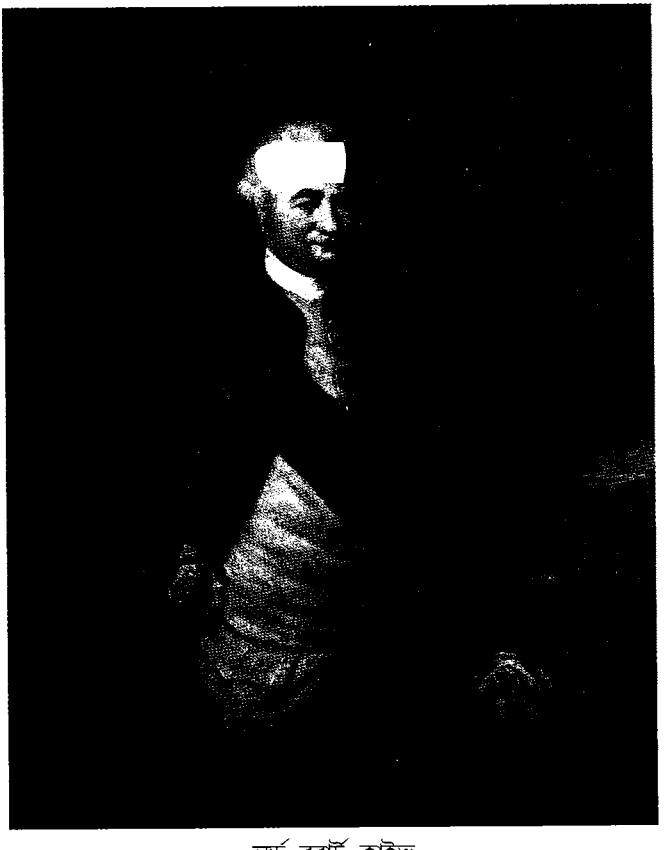

লর্ড রবার্ট ক্লাইভ

the INLAND NAVIGATION
by Rennell

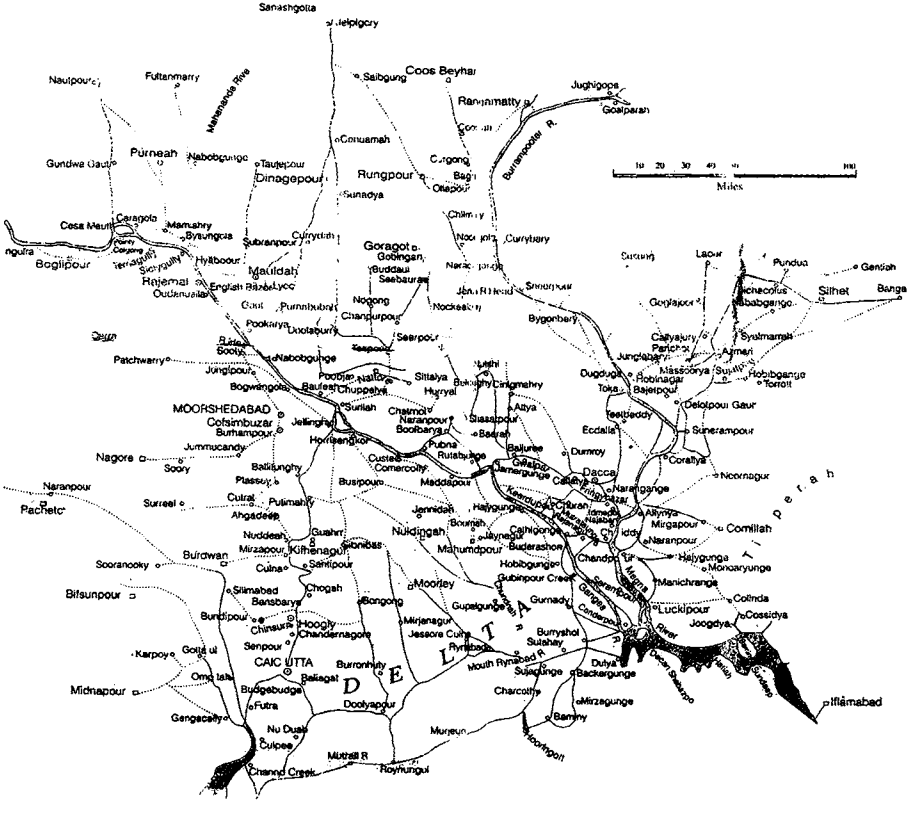

জেমস রেনেল কৃত ম্যাপ

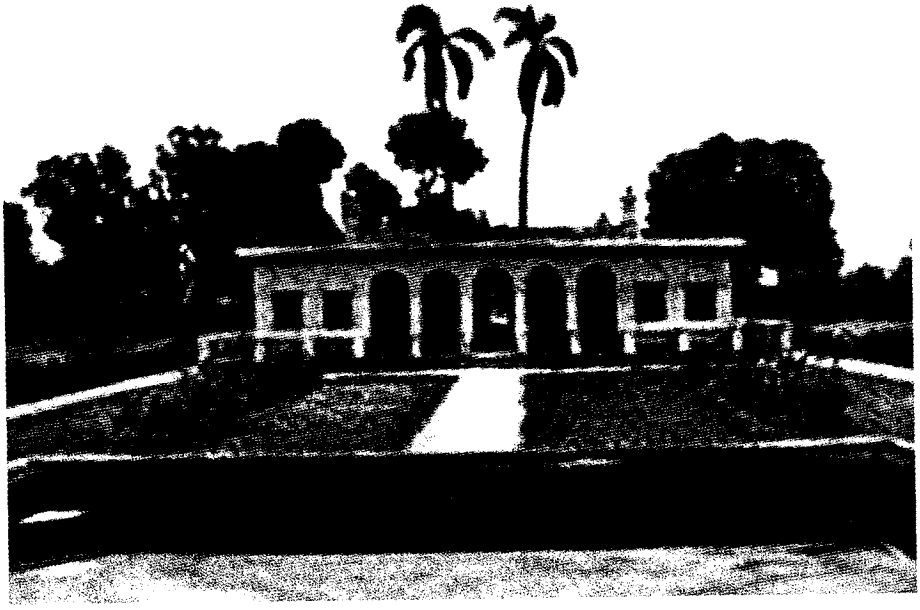

খোশবাগ

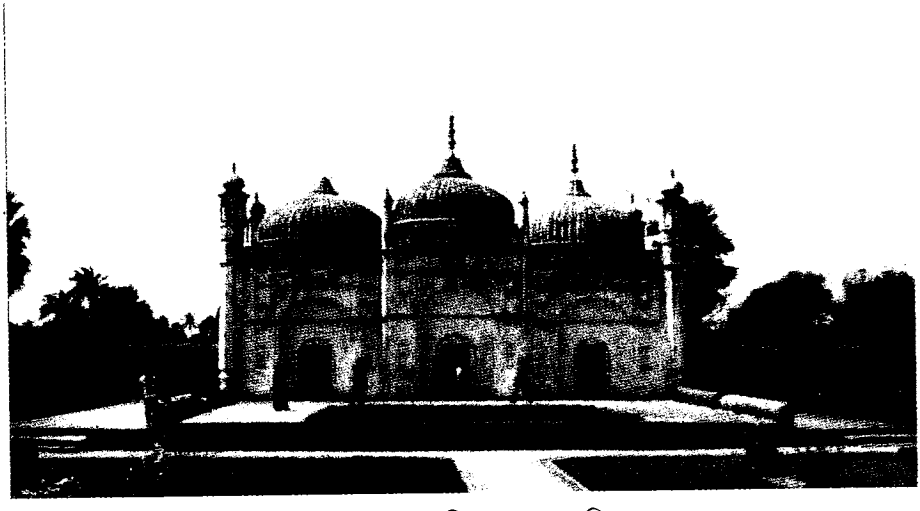

'খোশবাগ' সমাধি ক্ষেত্রের মসজিদ

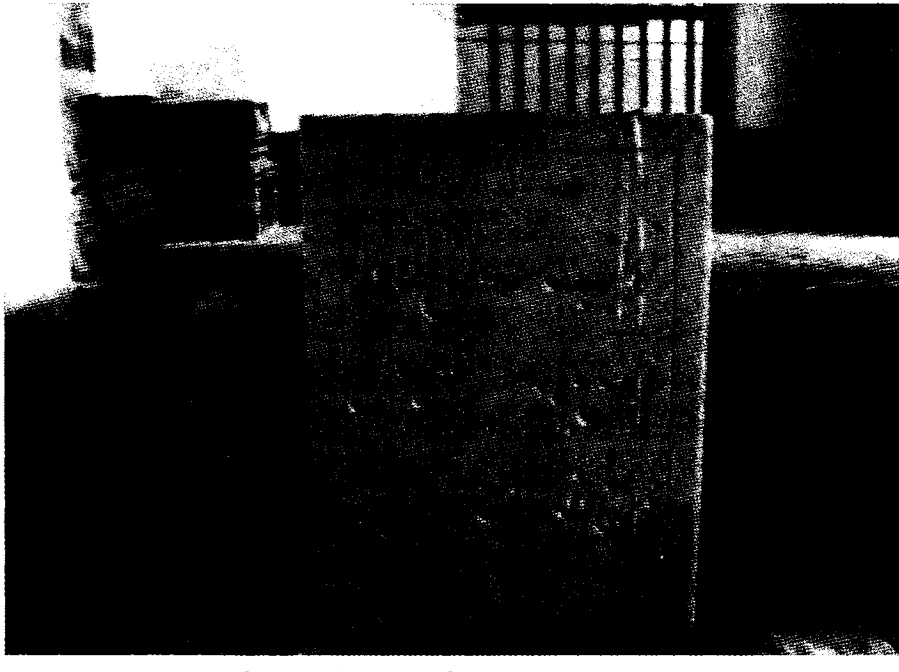

নবাব সিরাজউদ্‌দৌলার সমাধির সামনে মাথার কাছে ফলক

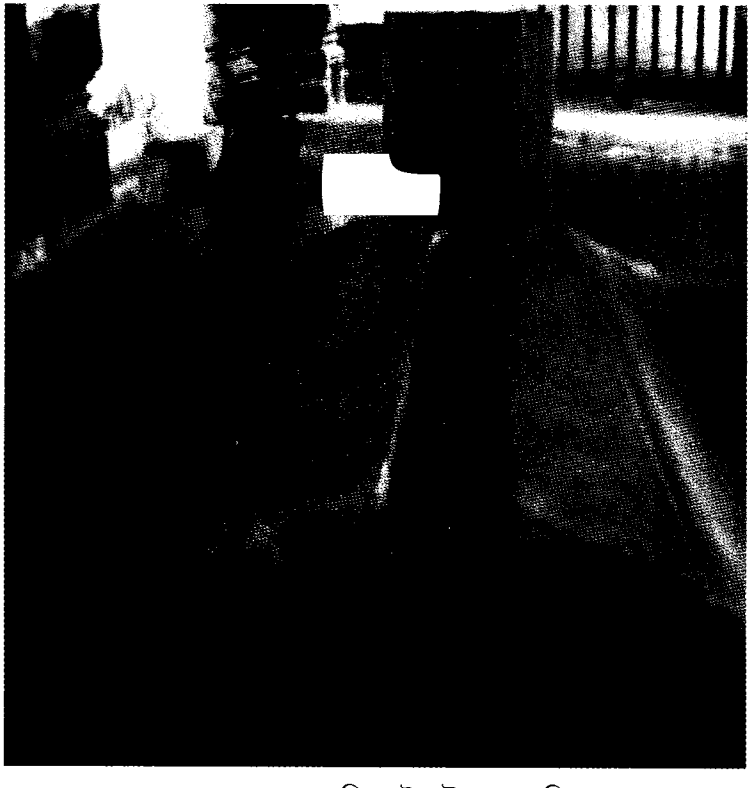

ফলকসহ নবাব সিরাজউদ্‌দৌলার সমাধি

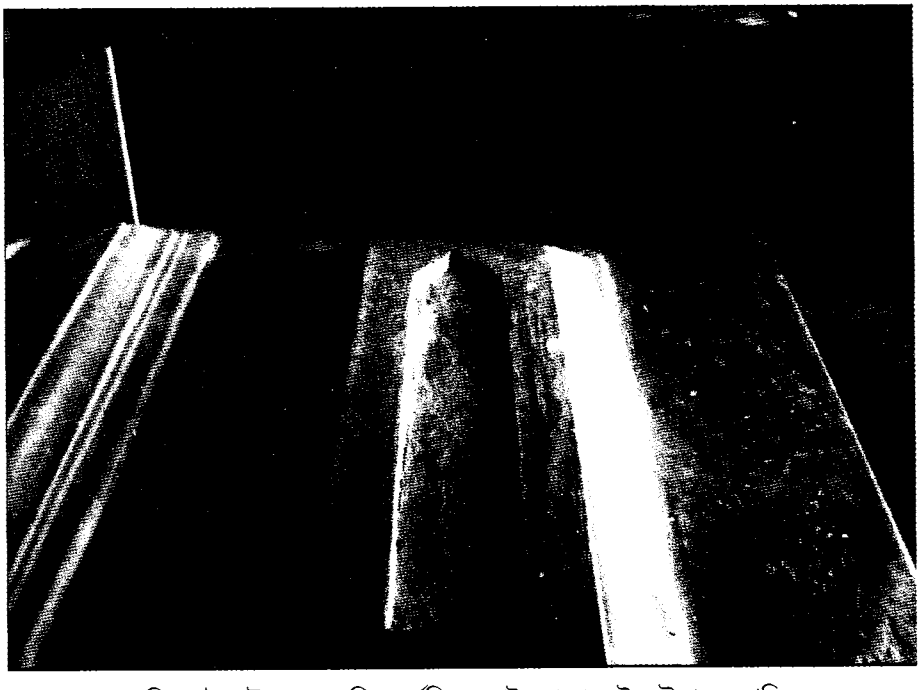

সিরাজউদ্‌দৌলার সমাধির পূর্বদিকে ভাই আক্রাম উদ্‌দৌলার সমাধি

হীরার (আলেয়া) সমাধি

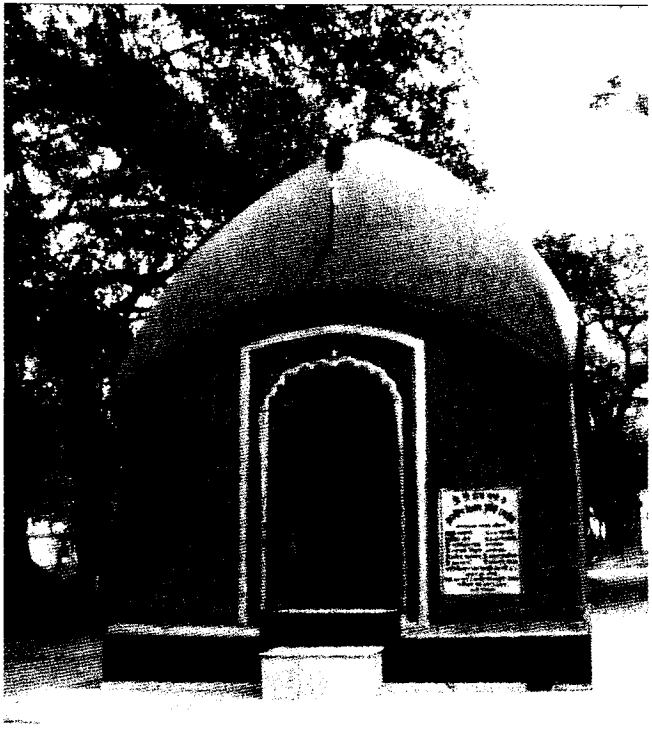

নদিয়া জেলার জুড়ানপুরের সতীপীঠের শিবমন্দির

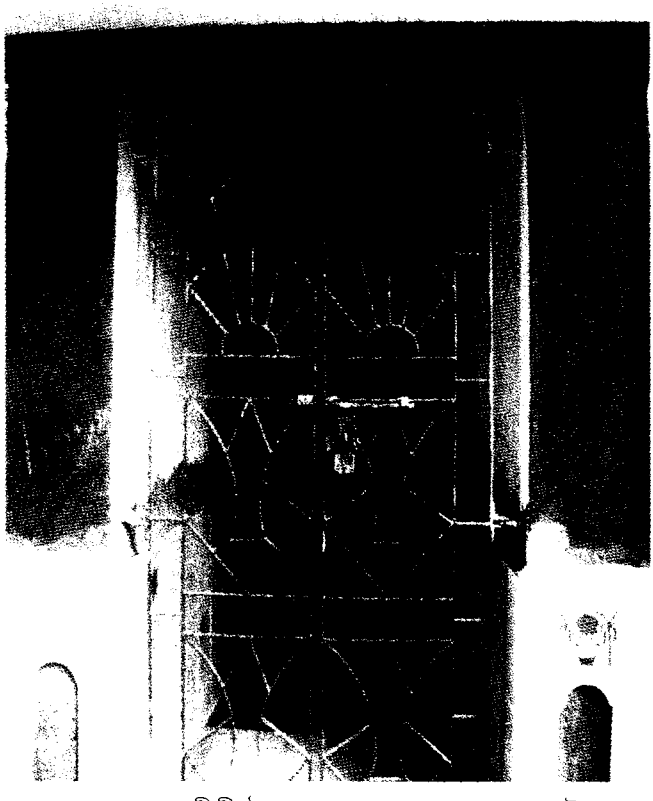

জুড়ানপুর সতীপীঠের পাতালগৃহের প্রবেশ পথের গেট

জুড়ানপুরে মহারাজা মোহনলালের কনিষ্ঠপুত্র হুক্কালালের বংশধরদের বাসগৃহের ধ্বংসাবশেষ যেখানে মহারাজা মোহনলালের জ্যেষ্ঠপুত্র রাজা শ্রীমন্তলালের শেষ বংশধর রাজা পৃথ্বিচাঁদ লাল এসেছিলেন ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে।

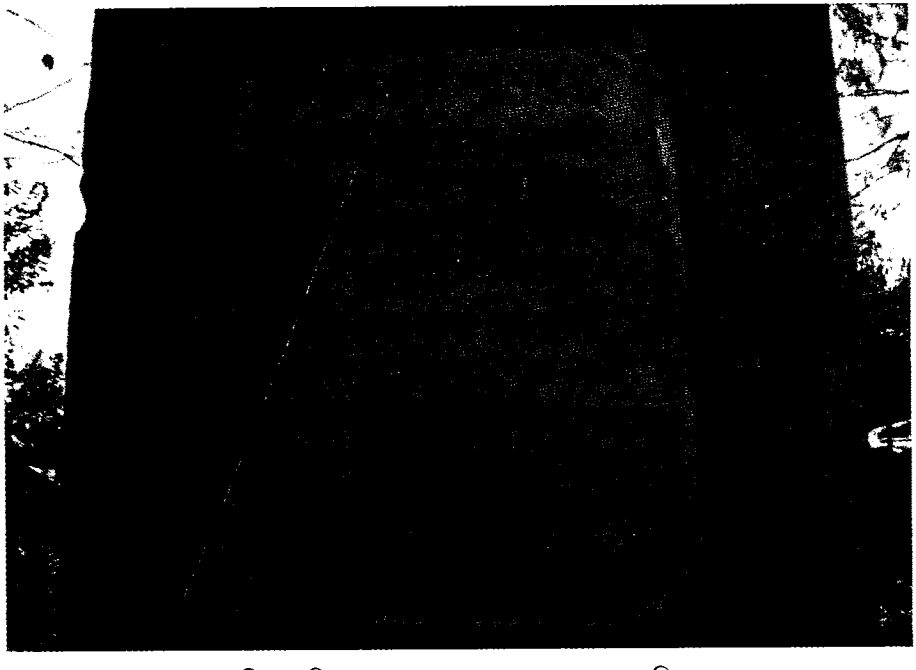

হুগলির গুপ্তিপাড়ার রাস্তার ধারে মোহনলাল স্মৃতিস্তম্ভ

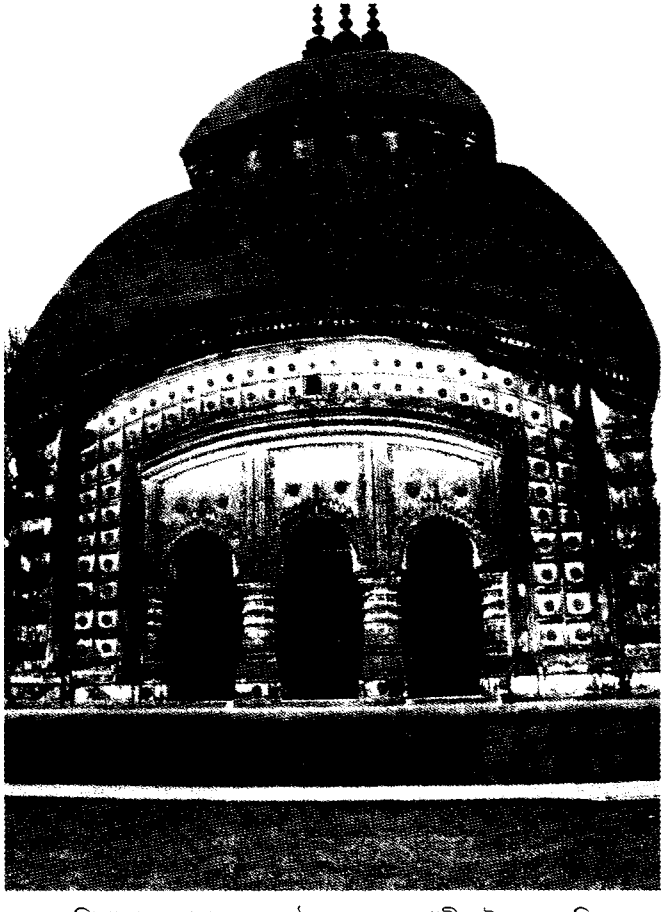

গুপ্তিপাড়া—ভগবানচন্দ্র মঠের সবচেয়ে প্রাচীন চৈতন্য মন্দির
—এখানেই মোহনলাল পলাতক ছিলেন।

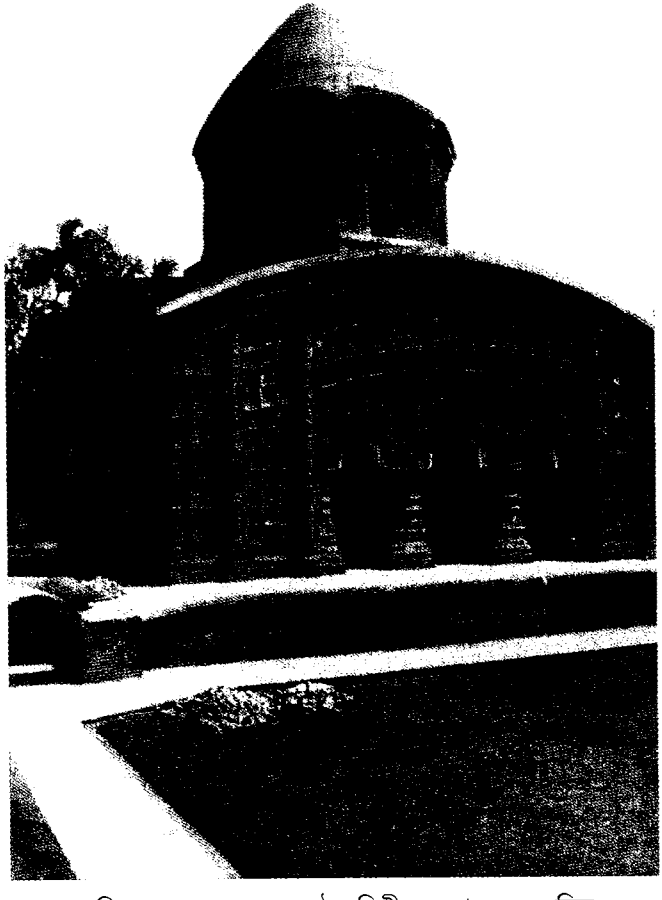

গুপ্তিপাড়া—ভগবানচন্দ্র মঠের দ্বিতীয়, বৃন্দাবনচন্দ্র মন্দির
—এখানেই মোহনলাল সন্ন্যাসী হিসেবে পলাতক ছিলেন।

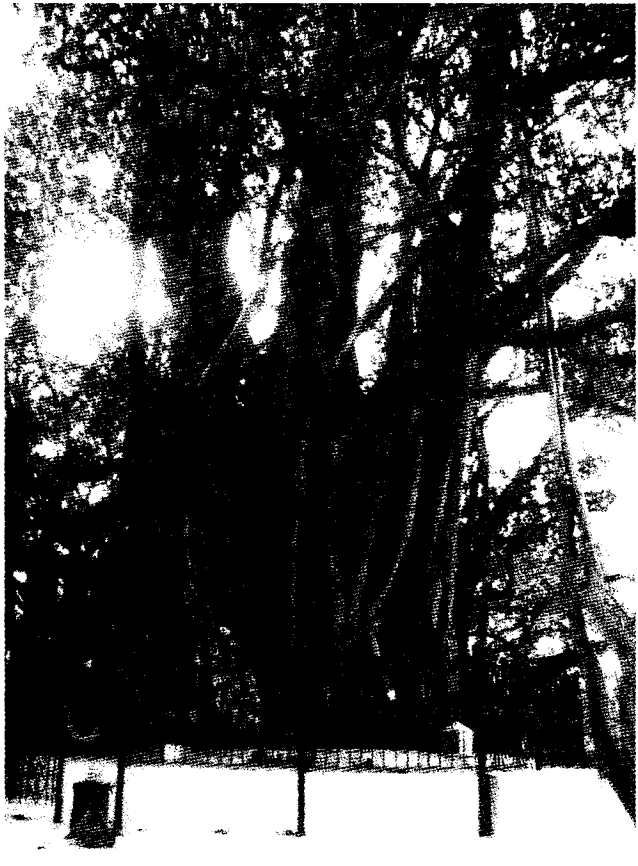

নদিয়ার জুড়ানপুর সতীপীঠের বটবৃক্ষের বাঁধানো বেদী—পূজাস্থল

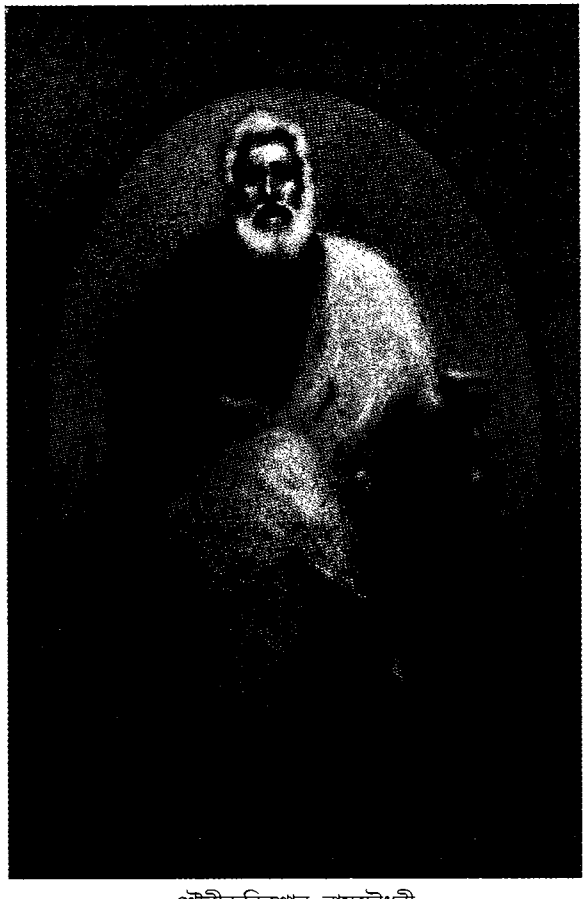

শৌরীন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

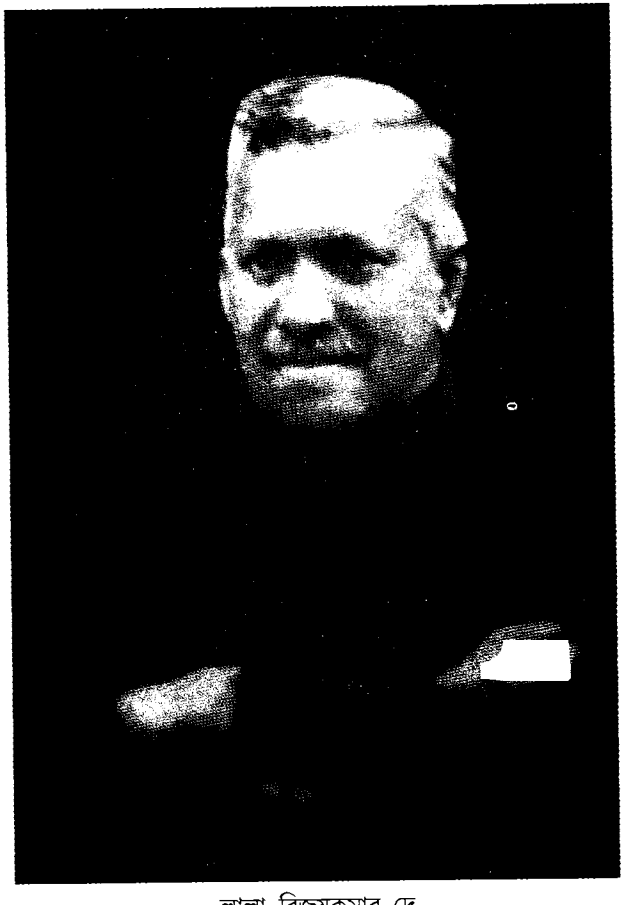

লালা বিজয়কুমার দে

শরদিন্দু দে ও তাঁর স্ত্রী সুষমা (পুরকায়স্থ) দে

লালা বিজন দে—ডানদিকে ছোটো ছেলে হানুট দে, বাঁদিকে স্ত্রী ও বড়ো ছেলে আটিয়ার দে

বীরেন দে—অশ্বারোহী

পলাশির যুদ্ধ সম্পর্কে বহু গ্রন্থ ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও কয়েকটি তথ্যের যথার্থ সন্ধান পাওয়া যায়নি। তারই কথা এই গ্রন্থে বলার চেষ্টা করা হয়েছে। স্যার যদুনাথ সরকার তাঁর সম্পাদিত *The History of Bengal* (Vol. II) গ্রন্থে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের পলাশির যুদ্ধ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেন এবং এই বিষয়ে ফারসি ও ইংরেজি ভাষায় রচিত গ্রন্থসমূহের চমৎকার বিশ্লেষণ করেন।[১] তিনি লেখেন, ২৩ জুন পলাশির প্রান্তরে সিরাজ-উদ্‌দৌলার সেনাবাহিনী মিরমদনের নেতৃত্বে ইংরেজ সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বাহাদুর আলি খান (মোহনলালের জামাতা) এবং আরও কয়েকজন দক্ষ সৈনিক। যদুনাথ সরকার লেখেন:

> When the rain ceased, Mir Madan ordered the long-waited-for gallant charge in the hope of overwhelming the English by numbers, thinking that their guns had been similary rendered useless by rain. But the rapid fire of grape-shot from the English guns at close range wrought havoc among the advancing crowd of Bengal cavaliers. Here at the head of the charge fell Mir Madan, Bahadur Ali Khan (the son-in-law of Mohan Lal and commander of the bahalia musketeers), Nauwe Singh Hazari (captain of artillery), and some other high officers. The advance was checked and the cavalry turned their faces towards their entrenchment.[২]

মিরমদন, বাহাদুর আলি খান, নওয়ে সিং হাজারি ও আরও কয়েকজন উচ্চ পদস্থ অফিসার মারা যাওয়াতে নবাব সিরাজউদ্‌দৌলা খুবই বিচলিত হন। তখন বেলা দুটো। তিনি মিরজাফরকে তাঁর শিবিরে ডেকে নিয়ে এসে কাতর আবেদন করেন। নবাব বলেন, 'It is for you to defend my honour'[৩] মিরজাফর

BanglaBook.org

কোরান স্পর্শ করে বলেন, তিনি ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন। তবে তিনি নবাবকে পরামর্শ দেন সেদিন অর্থাৎ ২৩ জুন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নবাবের সৈন্য তুলে নেবার জন্য এবং পরদিন সকালে তাঁর নেতৃত্বে নব উদ্যমে যুদ্ধ করার কথা বলেন। এই কথা বলে মিরজাফর নবাবের শিবির থেকে চলে আসেন এবং ক্লাইভকে নবাবের অসহায়তার কথা বলে ইংরেজ সৈন্যদের আক্রমণ করতে বলেন।[৪] যদুনাথ সরকার যেভাবে সমগ্র বিষয়ের বর্ণনা করেন তাঁর লেখা থেকেই উদ্ধৃত করছি:

> Treachery had been at work in the Nawabs army. On hearing of Mir Madan's fall, Siraj-ud-daulah had called Mir Jafar to his tent and appealed to his loyalty, by laying his turban at his feet and saying, 'It is for you to defend my honour'. Mir Jafar swore on the Quran to fight the English, and advised the Nawab to withdraw his troops from the field and fight with renewed vigour next morning under his leadership. On coming out of the Nawab's tent to his own troops in the field, he sent a letter to Clive telling him of the Nawab's helplessness and despair and urging the English to advance at once and seize the camp.[৫]

মিরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ পরামর্শ কাজ করতে শুরু করে। যুদ্ধক্ষেত্রে মিরমদন নিহত হবার পর নবাবের সেনাবাহিনীতে বিভ্রান্তি দেখা দেয়। যখন মিরজাফর সেদিনের জন্য যুদ্ধ পরিহার করার পরামর্শ নবাবকে দেন, তখন মোহনলাল পশ্চাদপসরণ করতে সম্মত হননি এই কারণে যে, তাহলে নবাবের চরম বিপর্যয় হবে। নবাবের আদেশ পেয়ে মোহনলাল যখন যুদ্ধ করা বন্ধ করেন তখন নবাবের সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়তে শুরু করে। যদুনাথ সরকার *Siyar-ul-Mutakherin* গ্রন্থ থেকে যে অংশ উদ্ধৃত করেন, তা হল:

> When Mir Jafar counselled the Nawab to suspend the fight for the day and recall his troops from the field, Mohan Lal refused to retreat on the ground that it would lead to a rout. But Mir Jafar stuck to his own advice and left the decision to Siraj.[৬]

BanglaBook.org

এই অবস্থায় নবাব দৃঢ়তা প্রদর্শন করে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি। তার ফলে নবাবের সৈন্যবাহিনীতে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। নবাবের সেনাবাহিনী যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পালাতে শুরু করে। বেলা ৪টার পরে নবাব নিজেও যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যান।[৭]

এখন যে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়, তা হল, মোহনলাল কি যুদ্ধে নিহত বা আহত হন?

S.C. Hill-এর গ্রন্থ *Bengal in 1756-57* (Vol. II, P. 426) উল্লেখ করে যদুনাথ সরকার লেখেন, নবাবের অফিসারদের মধ্যে মোহনলাল, মানিকচাঁদ (বাঙালি কায়স্থ) এবং খাজা হাদি আহত হন।[৮] উল্লেখ্য, ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে নবাব হবার পরই দৃঢ়তা প্রদর্শন করে সিরাজউদ্‌দৌলা যে দুজন দক্ষ অফিসারের ওপর আস্থা স্থাপন করেছিলেন তাঁরা হলেন মিরমদন ও মোহনলাল। এক সময়ে স্বার্থপর বিশ্বাসঘাতক মিরজাফরকে সেনাবাহিনীর প্রধান পদ থেকে সরিয়ে সিরাজ সে দায়িত্ব দেন মিরমদনকে। তেমনি মোহনলালকেও নবাবের দিওয়ান খানার পেসকার নিযুক্ত করে মোহনলালকে 'মহারাজা' পদবী দেন। যদুনাথ সরকার যেভাবে লেখেন তা উদ্ধৃত করা হল:

> The selfish traitor Mir Jafar was removed from the supreme headship of the army (**bakshi**) and the post given to brave and devoted Mir Madan. Another faithful and capable officer was Mohan Lal, the Kashmiri, whom he made **peshkar** of his **diwan-khanah,** with title Maharajah, and a degree of influence which turned him in effect into the prime minister.[৯]

এখানে আগেই আলোচনা করা হয়েছে, পলাশির যুদ্ধে মিরমদনের মৃত্যুর পর নবাব একেবারেই দৃঢ়তা প্রদর্শন করতে না পারায় বিজয় বিপর্যয় ডেকে নিয়ে আসেন। বিশ্বস্ত সেনাপতি মোহনলালকেও যুদ্ধ করতে বারন করেন। নবাবের অনুগত সেনাপতিদের মধ্যে ছিলেন মিরমদন, মোহনলাল, খাজা হাদি প্রভৃতি। পলাশির যুদ্ধের আগে সিরাজউদ্‌দৌলা যখন মিরজাফরকে বক্সিপদে ফিরিয়ে নিয়ে আনেন তখন এই তিনজন সেনাপতি প্রবল আপত্তি করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের কথায় কোনই গুরুত্ব দেননি। পলাশিতে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জুন যুদ্ধের সময়ে

BanglaBook.org

মিরজাফর, রায় দুর্লভ ও ইয়ার লতিফ বিশাল সৈন্যদল নিয়ে নীরব দর্শকের মতো দূরে দাঁড়িয়ে থেকে ক্লাইভকে জয়ী হবার সুযোগ করে দিয়েছেন। তাঁরা সিরাজউদ্‌দৌলার পতন ঘটানোর জন্য এই 'বিশ্বাসঘাকতকতা' করেন। যদুনাথ সরকার সিরাজের পরাজয়ের বিষয়ে বিস্তৃত করে আলোচনা করেন।[১০]

যুদনাথ সরকার লেখেন, মোহনলাল যুদ্ধে আহত হন। কিন্তু তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থের index অংশে লিখিত হয়, মোহনলাল পলাশির যুদ্ধে নিহত হন। এই index অংশ তৈরি করেছেন অধ্যাপক নীরদভূষণ রায়।[১১] অধ্যাপক রজত কান্ত রায় লেখেন: 'পলাশির যুদ্ধের পর নবাব সিরাজ-উদ্‌দৌলা ও রাজা মোহনলাল নিহত' হন। তিনি আর এক জায়গায় লেখেন, মোহনলাল যুদ্ধে 'জখম' হন।[১২] সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপিকা সোনিয়া আমিন মুর্শিদাবাদ ভ্রমণ করে এসে লেখেন: 'Mohan Lal would have been cremated and Mir Madan lies buried elsewhere.'[১৩] সোনিয়া আমিন হয়তো খানিকটা অনুমান করে লেখেন, মোহনলাল হিন্দু ছিলেন, তাই যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হবার পর তাঁর মরদেহ দাহ করা হয়েছে।

রজতকান্ত রায় তাঁর গ্রন্থের 'টীকা'য় লেখেন:

> মোহনলালের পুতি বা বেটি তা ইতিহাসে নির্দিষ্ট নেই। গোলাম হোসেন খান প্রণীত Seir Mutaqherin গ্রন্থের হাজি মুস্তফাকৃত ইংরেজি অনুবাদের মুস্তফাকৃত পাদটীকা থেকে জানা যায় সিরাজউদ্‌দৌলাক নিজের পরমাসুন্দরী স্বচ্ছগ্রীবা বা ক্ষীণতটী ভগিনীকে উপহার দিয়ে কাশ্মিরী মোহনলাল স্বীয় পদবৃদ্ধি করেছিলেন। এই কাশ্মিরী সুন্দরীর ওজন ছিল বাইশ্ সের মাত্র। পলাশির যুদ্ধের পর সিরাজউদ্‌দৌলাহ ও মোহনলাল নিহত হলে এই তন্বীর কী পরিণতি হল জানা যায় না। উপরোক্ত কবিতায় তাঁকে নির্দেশ করা হয়ে থাকতে পারে। নিশ্চিতভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়।[১৪]

এখানে রজতকান্ত রায় তাঁর গ্রন্থের প্রথমেই কবি ভারতচন্দ্র রায়ের অন্নদামঙ্গল এবং মোক্ষদারঞ্জন ভট্টাচার্য লিখিত 'নিরক্ষর কবি ও গ্রাম্য কবিতা' উল্লেখ করে 'মোহনলালের পুতি বা বেটি' সম্পর্কে মন্তব্য করেন। 'কলকাতায় বসে কান্দে মোহনলালের পুতি' কবিতার এই লাইন পড়ে তাঁর মনে হয়েছে মোহনলাল

BanglaBook.org

যুদ্ধে নিহত হন। রজতকান্ত রায় আরও লেখেন, 'নতুন নবাবের গণনায় ভুল হল। সুবাহময় রটে গেল তিনি জগৎ শেঠকে থাপ্পড় মেরেছেন, আর মিরজাফর, রায় দুর্লভ ইত্যাদি বড়ো বড়ো মোগল মনসবদারকে মোহনলালের বাড়ি সেলমে বাজাতে যেতে বলেছেন।'[১৫] যদুনাথ সরকার মোহনলাল সম্পর্কে যেভাবে আলোচনা করেন তার সঙ্গে রজতকান্ত রায়ের মোহনলাল সম্পর্কীয় আলোচনায় পার্থক্য-লক্ষ করা যায়। যদুনাথ সরকার নিজে ফার্সি ভাষায় দক্ষ ছিলেন। তাই তিনি গোলাম হোসেন রচিত *Seir Mutaqherin* নিজে ফার্সি ভাষায় পড়েছেন। তাঁকে সম্পূর্ণভাবে ইংরেজি অনুবাদের ওপর নির্ভর করতে হয়নি। হাজি মুস্তফাকৃত ইংরেজি অনুবাদের পাদটীকা কতটা নির্ভরযোগ্য সে প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবে মনে হবে।[১৬]

প্রশ্ন হল: *Seir Mutaqherin* গ্রন্থে কি মোহনলাল তাঁর নিজের বোনকে সিরাজকে উপহার দেন এই কথা রয়েছে? তার কোনো উল্লেখ এই বইতে দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু হাজি মুস্তফাকৃত ইংরেজি অনুবাদের পাদটীকায় এই সব কথা আছে। নিখিল নাথ রায় রচিত 'মুর্শিদাবাদ কাহিনী' কলকাতা থেকে ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তারপর এই গ্রন্থের অনেকগুলি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তিনি মুস্তফাকৃত ইংরেজি অনুবাদ প্রসঙ্গে লেখেন:

> মোহনলাল ভগিনীকে যে উপহার দিয়েছিলেন, ইহাও অনুবাদকের কথা। আমরা মূল মুতাক্ষরীনে তাহার কোনো উল্লেখ দেখিতে পাই না। সুতরাং এ বিষয়েও আমরা অনুবাদকের সহিত একমত নহি।[১৭]

প্রসঙ্গত নিখিলনাথ রায় সিরাজের ভালোবাসার পাত্রীদের সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ফৈজি ও মোহনলালের ভগিনীর রূপ বর্ণনা করেন। এই আলোচনা থেকে হাজি মুস্তফার মন্তব্য কতটা যথার্থ তা স্পষ্ট হবে। নিখিলনাথ রায় লেখেন:

> মুতাক্ষরীনের অনুবাদকের মতে ফৈজি ও মোহনলালের ভগিনী স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ হয় কিন্তু দুইজনের রূপবর্ণনা ও কৃশাঙ্গত্ব একই হওয়ায় দুইজনকে অভিন্ন মনে করা নিতান্ত অসংগত নহে। কেবল বর্ণনা ও কৃশাঙ্গের কথা বলিলে আমরা যথেষ্ট মনে করিতাম না। কিন্তু দুই জনের ওজন যখন ২২ সের বলিয়া উল্লিখিত, তখন সেই ধারণা আরও দৃঢ়

BanglaBook.org

হইয়া উঠে। কৃশাঙ্গত্ব ভারত নারীর সৌন্দর্যের পরিচয় বটে, কিন্তু ২২ সের ওজন যে-সমস্ত নারীর সৌন্দর্যের লক্ষণ, তাহা তো কখনো শুনা যায় নাই। সুতরাং দুই জনের ওজন ২২ সের ও একই প্রকার রূপবর্ণনা হওয়ায় দুই জনকে অভিন্ন বলিয়া প্রতীতি হওয়াই সম্ভব। স্টুয়ার্ট সাহেব ২২ সের ভারতনারীর-সৌন্দর্যের লক্ষণ না বলিয়া মোহনলালের ভগিনীর ওজন বলিয়াই লিখিয়াছেন।

She was a lady of the most delicate form and weighed only 64 lbs. English' (*Stewart's Bengal*, p-309). অনুবাদক মুস্তফা মুর্শিদাবাদের প্রবাদবাক্য হইতে ইহা সংগ্রহ করিয়াছেন। সেই সংগ্রহ যে একেবারে অভ্রান্ত তাহাই বা কীরূপে বলা যায়। ফলত ফৈজি ও মোহনলালের ভগিনীর অভেদের ধারণা নিতান্ত অসংগত নহে।'

আমি নিখিলনাথ রায়ের গ্রন্থ থেকে এই অংশ উদ্ধৃত করেছি এই কারণে যে, সিরাজ যেসব রমণীর রূপে আকৃষ্ট হয়েছিলেন সে বিষয়ে নিখিলনাথ রায় তাঁর গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা করেন। তিনি মুস্তাফা উল্লিখিত মোহনলালের ভগিনীর ওজন ২২ সের তত্ত্ব সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেন।[১৮]

মোহনলালের বোনের প্রকৃত নাম ছিল মাধবী। তাঁকে আদর করে হীরা বলে ডাকা হত। মোহনলালের সঙ্গে সিরাজউদ্‌দৌলার সখ্যতা ছিল। সেই সূত্রে হীরার সঙ্গেও সিরাজের অন্তরঙ্গতা হয়। আঠারো শতকের বাংলায় কাশ্মীর থেকে আগত মোহনলালের মতো মানুষের সংখ্যা একেবারেই বিরল ছিল। অথচ এই মানুষটি নিয়ে তেমন আলোচনা হয়নি। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে ছুতমার্গের ও সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামির ঊর্ধ্বে থেকে ব্রিটিশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে বাংলার নবাবের অনুগত হিসেবে যেভাবে সংগ্রাম করেন বাংলার রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবন আলোচনায় তার বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায় না। তিনি তাঁর মেয়েকে বিয়ে দিয়েছিলেন সিরাজের সেনাবাহিনীর বাহাদুর আলী খানের সঙ্গে। তিনি পলাশির প্রান্তরে বিশ্বস্ততার সঙ্গে যুদ্ধ পরিচালনা করে প্রাণ বিসর্জন করেন। হীরার সঙ্গে সিরাজের অন্তরঙ্গতার ফলে হীরার গর্ভে সিরাজের এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। সিরাজ হীরা ও তাঁর পুত্রকে নিজের আবাসস্থলে রাখেন। তখনও বৃদ্ধ আলিবর্দি এই সংবাদ পাননি। তিনি এই সংবাদ পেলে ভয়ানক ক্রুদ্ধ হবেন, এই আশঙ্কা সিরাজের ছিল। তাই সিরাজ যথেষ্ট গোপনীয়তা অবলম্বন করেন।

BanglaBook.org

আলিবর্দির ভয়ে সিরাজ পুত্রর প্রতি এমন আচরণ করেন যা স্বাভাবিক ছিল না। সিরাজ তাঁর পুত্রকে একটি ঘোড়ায় বসিয়ে বেঁধে দেন, তারপর ঘোড়াকে তীরবদ্ধ করে ছুটিয়ে দেন। সিরাজ ভেবেছিলেন কেউ হয়তো আহত ছুটন্ত ঘোড়াকে ধরে পুত্রকে রক্ষা করবে এবং লালন করবে।[১৯] এই সংবাদ পেয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে হীরা দৌড়ে গিয়ে মোহনলালকে সব বলেন। মোহনলাল দেরী না করে তাঁর নিজের ঘোড়ায় চড়ে দ্রুত ছুটে আহত ছুটন্ত ঘোরাকে থামিয়ে হীরার পুত্রকে নিয়ে চলে আসেন। মোহনলাল সিরাজের ওপর এতই ক্ষুব্ধ হন যে তাঁর পরিবারের সবাইকে নিয়ে মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত করেন। মোহনলালের সিদ্ধান্তের কথা জানতে পেরে আলিবর্দি কারণ অনুসন্ধান করে সমস্ত ঘটনার সঙ্গে পরিচিত হন। আলিবর্দি খুবই উদ্বিগ্ন হন। মোহনলাল চলে গেলে সিরাজের ভয়ানক ক্ষতি হবে বলে তিনি আশঙ্কা করেন। তাই আলিবর্দি কিছুতেই মোহনলালকে হারাতে চাননি। তিনি ঘটনাটি জানবার পর ইমামের সঙ্গে আলোচনা করে একটি মীমাংসার সূত্র বের করেন। হীরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে সমস্যার সমাধান সহজেই হয়ে যায়। হীরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন, তাঁর নতুন নামকরণ হয় আলেয়া (Aleya, আরবি শব্দ, অর্থ হল অভিজাত বা মহদ্‌বংশীয়, ইংরেজিতে তাকে high-born বলা হয়)। তারপর ইসলামিক রীতি অনুযায়ী সিরাজউদদৌলার সঙ্গে আলেয়ার বিবাহ সম্পন্ন হয়। নবাবের প্রাসাদের যেখানে বিয়ের অনুষ্ঠান হল, তার পাশে একটি ঝিল ছিল। তার নাম হল 'হীরা ঝিল'। অবশ্য হীরা ঝিল বর্তমানে নেই। অনেক আগেই ভাগীরথী গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। আলিবার্দির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মোহনলালকেই সিরাজের পুত্রের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়।[২০] হীরা অর্থাৎ আলেয়ার স্থান যে নবাবের প্রাসাদে সম্মানিত ছিল তা বোঝা যায় তাঁর মৃত্যুর পরে খোশবাগের নবাব পরিবারের সমাধি ক্ষেত্রে তাঁকে সমাহিত করা হয় দেখে। সোনিয়া আমিন তাঁর প্রবন্ধে আলেয়ার কবর দেখে তাঁকে মোহনলালের বোন হিসেবেই চিহ্নিত করেন। তাঁর রচনা থেকে আমি প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করছি:

> We stepped into the last enclosure. Here lie Alivardi khan, Siraj's three year old daughter Ummatul Zahwra and wife Lutfunnesa, Aleya (Mohan Lal's sister), and in a further twist, Shaukat Jang, whom Siraj had slain.[২১]

BanglaBook.org

এবার সিরাজউদ্‌দৌলার স্ত্রীদের সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলছি। 'মুর্শিদাবাদ কাহিনী' গ্রন্থের লেখক নিখিলনাথ রায় লেখেন:

> সিরাজের কয়টি স্ত্রী ছিলেন তাহা স্থির করা যায় না। কেবল তিন বা চারিজনের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

'মোহনলালের ভগিনী' যে সিরাজের স্ত্রী ছিলেন সে কথা নিখিলনাথ রায় উল্লেখ করেন। তবে তাঁর নাম বলেননি। নিখিল নাথ রায় অন্যান্য স্ত্রীদের নাম উল্লেখ করেছেন।[২২] ধর্মান্তরিত হবার পরে হীরার নাম হল আলেয়া। তাঁর যে একটি পুত্র সন্তান ছিল সে বিষয়ে কোনো লেখকের রচনাতে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। সিরাজের পুত্রের বংশধর হিসেবে যাঁরা দাবি করেন তাঁদের কাছ থেকে সংগৃহীত তথ্যের সাহায্যে মোহনলাল ও সিরাজের পুত্রের ওপর আলোকপাত করবার প্রয়াস করেছি।[২৩]

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জুন মিরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে পলাশির যুদ্ধক্ষেত্রে যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় তখনই মোহনলাল নবাবের বিপর্যয় সম্পর্কে সচেতন হন। তাঁর নিজের ও সিরাজের পুত্রের জীবন বিপন্ন হতে পারে এমন আশঙ্কা তিনি করেন। তাই মোহনলাল সময় নষ্ট না করে ক্ষিপ্রগতিতে যেভাবে সিরাজের পুত্রকে নিয়ে মুর্শিদাবাদ ছেড়ে চলে যান তাতে অনুমান করা যায় তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে গুরুতর আহত হননি। হয়তো মিরজাফর ও ইংরেজ গুপ্তচরদের বিভ্রান্ত করার জন্য প্রচার করে দেন তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে আহত হয়েছেন। তিনি বুঝতে পারেন তাঁকে ও সিরাজের পুত্রকে হত্যা করা হবে। তাই বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে সবার অলক্ষ্যে মোহনলাল ছয় বছরের সিরাজপুত্রকে নিয়ে মুর্শিদাবাদ ছেড়ে চলে যান। তাঁর সঙ্গে বাসুদেব ও হরনন্দ নামে দুজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁরা পদ্মা নদী পার হয়ে ময়মনসিংহের জমিদারির অন্তর্ভুক্ত বোকাইনগর দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। 'রেনেলকৃত বাঙ্গলাদেশের প্রাচীন মানচিত্রে' ময়মনসিংহ জেলায় বোকাইনগর গ্রামের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়।[২৪]

ক্লাইভ ও মিরজাফর চারদিকে গুপ্তচর পাঠিয়ে তাঁদের ধরবার চেষ্টা করছে, এই খবর পেয়ে মোহনলাল বোকাইনগরের দুর্গ নিরাপদ মনে করেননি। মোহনলালের বিশ্বস্ত সঙ্গী বাসুদেবের কাকা বিনোদ রায় আমহাটি গ্রামে বাস করতেন। মোহনলাল

BanglaBook.org

সিরাজ পুত্রকে সেই বাড়িতে রেখে তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন। মোহনলাল সিরাজ পুত্রকে দত্তক রাখার জন্য ময়মনসিংহের জমিদার শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরীর সঙ্গে কথা বলেন। তিনি সম্মতি দান করেন। কিন্তু নিরাপত্তার জন্য মোহনলালের এক স্থানে থাকা সম্ভব হয়নি। তাই তিনি ও তাঁর দুই সঙ্গী সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করেন। তাঁরা রংপুর যাবার পরিকল্পনা করেন। কিছুদিন গোপনে সেখানে থাকার পর তাঁরা ফিরে এসে ময়নমনসিংহের জমিদার শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে শোনেন তিনি মারা গেছেন। তখন তাঁরা শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরীর বড়ো ছেলে কৃষ্ণকিশোরের সঙ্গে সিরাজ পুত্রকে দত্তক নেবার বিষয়ে আলোচনা করেন। প্রসঙ্গত এই বিষয়ে তাঁর পিতার সম্মতির কথাও বলেন। তাঁর ছোটো ভাই কৃষ্ণগোপাল দুবার বিবাহ করলেও তাঁর কোনো সন্তান ছিল না। কৃষ্ণকিশোর ও কৃষ্ণগোপাল কেউ জানতেন না তাঁরা সিরাজ পুত্রকে দত্তক নিচ্ছেন। তাঁদের বলা হল, বাসুদেবের কাকা আমহাটির বিনোদ রায়ের দ্বিতীয় পুত্রকে দত্তক নিচ্ছেন। বিনোদ রায় তাঁর প্রথম স্ত্রীর গ্রাম আমহাটিতেই থাকতেন। যথারীতি অনুষ্ঠান করে কৃষ্ণগোপাল এই পুত্রকে দত্তক নেন এবং তার নামকরণ হয় যুগলকিশোর রায়চৌধুরী। মোহনলাল ছদ্মবেশে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এই দত্তক পুত্র কৃষ্ণগোপালের পিণ্ডাধিকারী ও উত্তরাধিকারী হন। এই ভাবে সিরাজউদ্‌দৌলা ও আলেয়ার পুত্র ভিন্ন নামে পরিচিত হন। এই তথ্য মোহনলাল ও তাঁর দুই সঙ্গী ছাড়া কারও জানা সম্ভব ছিল না।[২৫]

যুগলকিশোর ময়মনসিংহের জমিদার পরিবারে বড়ো হয়ে ওঠেন। তাঁর সম্পর্কে অনেক তথ্য এই জমিদার পরিবারের সূত্রে জানা যায়। ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে কৃষ্ণগোপাল মারা যান। যুগল কিশোর তাঁর জেঠামশায় কৃষ্ণকিশোরের তত্ত্বাবধানে জমিদারি ব্যবস্থা পরিচালনার অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। এই জমিদারিতে মহাসমারোহে রথযাত্রা উৎসব হত। ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে রথযাত্রা উৎসবে একটি দুর্ঘটনায় কৃষ্ণকিশোর ও কয়েকজন ভৃত্যের মৃত্যু হয়। এই দুর্ঘটনার পর এই পরিবারের রথযাত্রা পূজা নিষিদ্ধ হয়। কৃষ্ণকিশোর মারা যাবার পর যুগলকিশোর জেঠার বিধবা স্ত্রীদের ভালোভাবে দেখাশুনা করেন। তাছাড়া তিনি কৃষ্ণগোপালের বিধবা স্ত্রীদেরও পরম যত্নে রাখেন। তাঁদের প্রতি যুগলকিশোর খুবই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।[২৬]

ইতিমধ্যে জফরশাহি অঞ্চলে ভীষণ মহামারিতে বহুলোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অনেক চেষ্টা করেও যুগলকিশোর মহামারির ভয়াবহতা থেকে অঞ্চলকে রক্ষা

BanglaBook.org

করতে পারেননি। তিনি উপলব্ধি করেন এই ভয়ানক অস্বাস্থ্যকর জায়গায় বাস করা অনুচিত হবে। যুগলকিশোর কৃষ্ণপুর ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত করেন। বাসস্থান নির্বাচিত হল এবং যাত্রার আয়োজন আরম্ভ হল। বড়ো বড়ো নৌকা কৃষ্ণপুরের ঘাটে সমবেত করা হল। ধন, রত্ন, দ্রব্য সামগ্রী ও পরিবার পরিজনসহ নৌকায় উঠে যুগলকিশোর ময়মনসিংহ পরগনার গৌরীপুরের অভিমুখে যাত্রা করেন। যথাসময়ে নৌকাগুলি গৌরীপুরের বালুয়াঘাটে উপস্থিত হল। কিন্তু গৌরীপুরের বাড়ি তখনও বসবাসের উপযোগী না হওয়াতে তাঁদের কয়েকদিন নৌকায় বাস করতে হয়। বাড়ি নির্মাণ শেষ হলে শুভদিনে যুগলকিশোর সবাইকে নিয়ে গৌরীপুরের বাড়িতে প্রবেশ করেন।[২৭] এই সময়ে গৌরীপুর বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। এই অঞ্চল চাষবাসহীন ও জনবসতিহীন ছিল। অল্প সংখ্যক নিম্ন শ্রেণির মানুষ গ্রামের বাসিন্দা ছিল। যুগলকিশোরের মতো দক্ষ জমিদার সেখানে বাস করার পরে দ্রুত এই অঞ্চলের পরিবর্তন ঘটে। বহু সংখ্যক বাসগৃহ নির্মিত হয়। জনবসতি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়। যুগল কিশোর নিশ্চিন্তে জমিদারি পরিচালনায় নিবিষ্ট হতে পারেন। প্রজারা তাঁকে ভয় ও শ্রদ্ধা করতে থাকে। তাঁকে অমান্য করার সাহস কারও ছিল না।[২৮] যুগল কিশোর অতি তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। বিষয় বুদ্ধিতে তাঁর মতো বিচক্ষণ মানুষ অল্পই ছিল। গৃহ-বিবাদের সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকটি ঘটনায় যুগলকিশোর যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হন। এই সময়ে সন্ন্যাসী বিদ্রোহে ময়মনসিংহ বড়োই প্রপীড়িত হয়েছিল। সরকার সন্ন্যাসী বিদ্রোহ দমনের জন্য জমিদারের সাহায্যপ্রার্থী হয়। একদিকে খাজনা আদায়ের অসুবিধা, অন্যদিকে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ দমনে সরকারকে সাহায্য, এই কারণে জমিদাররা বিপন্নবোধ করেন। যুগলকিশোর দক্ষতার সঙ্গে জমিদারি পরিচালনা করলেও আর্থিক ক্ষতি থেকে মুক্তিলাভ করতে পারেননি।[২৯]

এই সময়ে ময়মনসিংহে প্রবল বন্যার ফলে সংকট দেখা দেয়। বন্যায় ঘরবাড়ি, মানুষ ও গবাদি পশু ভেসে যায়। খাদ্যের অভাব তীব্র হওয়ায় প্রজারা অনেকেই বাইরে চলে যায়। বন্যার জলে, রোগে ও অনাহারে বহু লোকের মৃত্যু হল। তার মধ্যে আবার লুটপাটও শুরু হয়। অরাজকতার তাণ্ডবে ময়মনসিংহ কম্পিত হয়। এই সময়ে যুগলকিশোর বন্যায় বিপর্যস্ত মানুষের দুর্দশা দূর করবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। যাদের বাড়িঘরদোর ভেঙে পড়েছে তাদের তিনি আর্থিক সাহায্য দেন এবং অসুস্থ ব্যক্তিদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু তাঁর প্রচেষ্টা

BanglaBook.org

সত্ত্বেও বন্যার পরে কয়েকটি অঞ্চলে অপরাধমূলক কাজকর্ম বৃদ্ধি পায়, বিশেষ করে সিন্ধা (Sindha) পরগনার গ্রামসমূহে অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। তাই এই অত্যাচার দমনের জন্য যুগলকিশোর বদ্ধপরিকর হন।[৩০]

সিন্ধ্যা পরগনার জমিদার ছিলেন মুসলমান। তিনি শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরীর প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাওয়ায় তাঁর ও তাঁর বংশধরদের প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করেন। এই জমিদারির ক্ষতিসাধন করাই সিন্ধার জমিদারের প্রধান উদ্দেশ্য হয়। সিন্ধার জমিদার ছিলেন মহম্মদ খাঁ। জলপ্লাবনের পর সিন্ধার জমিদারের প্রশ্রয়ে সিন্ধার প্রজাগণ দলবদ্ধ হয়ে বহুগ্রামের প্রজাগণের সর্বস্ব লুণ্ঠন করতে লাগল। লুণ্ঠন, অত্যাচার পীড়নে প্রজারা ব্যাকুল হয়ে উঠল। বহু প্রজা দেশ ত্যাগ করে পালিয়ে যেতে লাগল। এই সময়ে যুগলকিশোর প্রজাদের দুঃখ দুর্দশা দূর করবার চেষ্টা করেন। তখন দেশের শান্তি স্থাপনের দায়িত্ব জমিদারের ছিল। যুগলকিশোর ডাকাতদের ধৃত ও দণ্ডিত করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। কিন্তু শত চেষ্টাতেও ডাকাতদের ধরা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। সিন্ধার প্রজারা ক্রমশ প্রশয় পেয়ে দলবৃদ্ধি করে, বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে স্থানে স্থানে প্রজাগণের ওপর অত্যাচার করতে আরম্ভ করল। এই অবস্থায় যুগলকিশোরের জমিদারির প্রজারা ভয়ানক বিপর্যস্ত হয়। যুগলকিশোর তাঁর প্রজাদের দুরবস্থার কথা উল্লেখ করে সিন্ধার জমিদার মহম্মদ খাঁকে তা বন্ধ করতে বলেন। মহম্মদ খাঁ এই অনুরোধে কর্ণপাত না করে অবজ্ঞার সাথে উত্তর পাঠান।[৩১]

স্বভাবতই যুগলকিশোর ভয়ানক ক্রুদ্ধ হন। তিনি ১৭৭৯ খ্রিস্টাব্দে প্রায় পাঁচ হাজার লাঠিয়াল নিয়ে সিন্ধা আক্রমণ করতে অগ্রসর হন। তাঁর পদাতিক দলে লাঠি, বর্শা, সড়কি ও তরবারির আস্ফালন ছিল। তারা সিন্ধার মধ্যে প্রবেশ করে সিন্ধার প্রজাগণের সর্বস্ব লুণ্ঠন করে, সমস্ত বাড়ি ভস্মীভূত করে। কেউ নিপীড়িত প্রজার আকুল আর্তনাদে কর্ণপাত করেনি। এই অত্যাচারের ফলে 'যুগলকিশোরের প্রতিভাপূর্ণ জীবন কলঙ্ক কালিমায় আবৃত হইল'।[৩২]

এই সময় ময়মনসিংহে নতুন জেলা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রটন সাহেব এই জেলার কালেকটর পদে নিযুক্ত হয়ে এসেছেন। সিন্ধার জমিদার মহম্মদ খাঁ তাঁর নিকট যুগলকিশোরের অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা করে অভিযোগ করেন। অত্যাচার বন্ধ করা ও অত্যাচারিদের শাস্তিদানের জন্য বিশেষভাবে আবেদন করা

BanglaBook.org

হয়। রটন সাহেব তদন্তের জন্য আমিন, কাননগু, কাজি প্রভৃতি প্রেরণ করেন। অনুসন্ধানকারীগণ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে অত্যাচারের ভীষণ দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত হন। তাঁরা যে বিবরণ সংগ্রহ করেন তা লিপিবদ্ধ করে রটন সাহেবের নিকট প্রেরণ করেন। রটন সাহেব আমিনের রিপোর্টসহ কাগজপত্র ঢাকার কমিশনারের কাছে পাঠিয়ে দেন। তখন ঢাকার কমিশনার ছিলেন ডগলাস। তিনি ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দের ১ জুলাই কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম রেভিনিউ বোর্ডের নিকট যুগলকিশোর রায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্বন্ধে একটি রিপোর্ট প্রেরণ করেন। কমিশনার সাহেবের রিপোর্ট পেয়ে রেভিনিউ বোর্ডের সদস্যরা যুগলকিশোরকে শাস্তি দান করে জমিদারদের অত্যাচার বন্ধ করবার জন্য কমিশনার ডগলাস সাহেবকে আদেশ প্রেরণ করেন। ডগলাস সাহেব রটন সাহেবকে লেখেন:

> অত্যাচারী জমিদার যুগলকিশোর রায়ের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া তাহাকে বিচারের জন্য অবিলম্বে ঢাকায় প্রেরণ করো।[৩৩]

রটন সাহেব কমিশনারের এই আদেশ পাওয়ায় সমস্যায় পড়েন। তিনি যুগলকিশোরকে বিশেষভাবে জানতেন। সন্ন্যাসী বিদ্রোহের সময়ে যুগলকিশোর যেভাবে গভর্নমেন্টকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করেন ও পরিশ্রম করেন সে বিষয়ে রটন সাহেবের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল। তাছাড়া যুগলকিশোর ঐশ্বর্যশালী সম্ভ্রান্ত জমিদার হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি 'তস্কর বৃত্তি অবলম্বন' করবেন তা রটন সাহেব বিশ্বাস করতে পারেননি। অন্যদিকে রেভিনিউ বোর্ড ও কমিশনারের আদেশ অমান্য করাও সম্ভব নয়। যুগলকিশোরের মতো শক্তিশালী জমিদারকে বিচারের পূর্বে বন্দি করে দূর স্থানে প্রেরণ করলে প্রজারা ক্ষুব্ধ হতে পারে। তাছাড়া সন্ন্যাসী বিদ্রোহ তখনও সম্পূর্ণভাবে দমিত হয়নি। যুগলকিশোর জ্বরে আক্রান্ত হয়ে শয্যাগত আছেন। তাঁকে জলপথে ঢাকা নিয়ে গেলে তাঁর রোগ বৃদ্ধি পেতে পারে। ঢাকাতে বিচারের ব্যবস্থা করলে সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ করতেও অসুবিধা হবে। তাই রটন সাহেব নসিরাবাদ শহরে কোনো বিচারক পাঠিয়ে এই মোকদ্দমার বিচার করলে সকল বিষয়ে সুবিধা হবে এই মনোভাব ব্যক্ত করেন। কমিশনার ডগলাস রটন সাহেবের বক্তব্য যুক্তিযুক্ত মনে করে নসিরাবাদে যুগলকিশোরের বিচারের ব্যবস্থা করতে আদেশ দেন।[৩৪]

BanglaBook.org

যুগলকিশোর রায়কে বিচারের জন্য নসিরাবাদ আনা হল। তাঁকে জামিন দিয়ে মুক্তি প্রার্থনা করা হলেও তা গ্রাহ্য হয়নি। প্রথম রাতে তাঁকে হাজত বাস করতে হয়। তিনি নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন, তাই হাজতে জল পর্যন্ত গ্রহণ করতে স্বীকৃত হননি। তিনি অনাহারে প্রাণ ত্যাগ করতে প্রস্তুত হন। তখন যুগলকিশোরকে তাঁবুতে বাস করবার অনুমতি দেওয়া হয়। তাঁর জন্য ভৃত্য পাচক নিযুক্ত হল। তাঁকে অবশ্য প্রহরী বেষ্টিত করে রাখা হয়। বিচার আরম্ভ হলে বহুলোক বিচারালয়ে উপস্থিত হয়ে বিচার দেখতে থাকেন। সেই সময়ে এই বিচারই একমাত্র আলাপের বিষয় হল। সিন্ধার জমিদার মোকদ্দমার তদ্বির করতে লাগলেন। যুগলকিশোরের কাছ থেকেও তদ্বিরের ত্রুটি হল না। অনেকেই বিচারালয়ে উপস্থিত হতে অস্বীকার করল। যারা উপস্থিত হল তাদের মধ্যে কেউ সত্য বলল, কেউ সম্পূর্ণ মিথ্যা বলল। সম্ভ্রান্ত শ্রেণির কোনো লোকই সাক্ষ্য দেননি। যুগলকিশোরের ভয়ে অনেকেই তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে সাহসী হয়নি। তার ফলে লুণ্ঠন, গৃহদাহ প্রভৃতি কার্য যে হয়েছে তা প্রতিপন্ন হল। কিন্তু এই সমস্ত কার্য যে যুগলকিশোর রায় কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়েছে তা কেউ শপথ করে বলতে পারল না। যুগলকিশোর রায়কে কেউ দেখেনি, তিনি যে লুণ্ঠন ও বাড়ি পোড়াতে আদেশ দিয়েছেন তাও কেউ শোনেনি। তাই অনুমানের ওপর নির্ভর করে তাঁকে শাস্তি দান করা সম্ভব হয়নি। কাজেই মামলা হতে তিনি অব্যাহতি লাভ করেন। তবে যুগলকিশোরকে সতর্ক করে দেওয়া হয় এবং এই জন্য গভর্নমেন্ট যুগলকিশোরের নিকট থেকে 'একখণ্ড অঙ্গীকার পত্র' লিখিয়ে নেয়। এই মোকদ্দমায় যুগল কিশোরের শারীরিক ক্লেশ, উদ্‌বেগ ও প্রচুর আর্থিক ক্ষতি হয়।[৩৫]

যুগলকিশোর রায় অতি বুদ্ধিমান, চতুর ও দক্ষ জমিদার ছিলেন। ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে কালেকটর রটন সাহেব একটি নোটে তাঁর প্রশংসাও করেন। পারিবারিক বিরোধ, সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ও সিন্ধার দস্যু দমনে তাঁর ভূমিকার জন্য 'লোকে তাহাকে বিবাদপ্রিয় বলিয়া চিত্রিত করিলেও স্বভাবত তিনি ন্যায়-পথ বর্জিত ছিলেন না।'[৩৬] যুগলকিশোরের সাথে তাঁর প্রয়াত জেঠার দুই বিধবা স্ত্রীও গৌরীপুরে বাস করতেন। কিন্তু যুগলকিশোরের সঙ্গে দুই বিধবা রত্নমালা ও নারায়ণীর মধ্যে মনোমালিন্য ভয়ানক পারিবারিক জটিলতার সৃষ্টি করে। এই দুই বিধবা তাঁদের 'পতির জলপিণ্ড সংস্থানের জন্য দত্তক পুত্র গ্রহণে অভিলাষিণী' হন। যুগলকিশোর তাতে ভয়ানক আপত্তি করেন। তিনি বলেন:

BanglaBook.org

আমি আপনাদের পুত্ররূপে বর্তমানে আছি। পিতৃ-পুরুষের জলপিণ্ড দিবার জন্যই আমাকে গ্রহণ করিয়াছেন। অন্য দত্তক গ্রহণ করিয়া আত্মবিরোধের বীজ বপন করা সংগত নহে। আপনারা দান-ধ্যান করুন, বৃথা দত্তক গ্রহণ করিয়া সম্পত্তি বিভাগ করায় কিছু মাত্র ফল নাই।

কিন্তু বিধবারা তাঁর কথায় মোটেই সন্তুষ্ট হননি। তাঁরা দত্তক গ্রহণের জন্য ব্যস্ত হন। তার ফলে তাঁদের মধ্যে বিবাদের সূচনা হয়।[৩৭]

এই বিধবা স্ত্রী লোকদের হাতে সম্পত্তি থাকলে দুষ্ট লোকের পরামর্শে ক্ষতি হতে পারে মনে করে যুগলকিশোর অনেক চিন্তা করে বিধবাদের নিকট থেকে নিজ নামে সমস্ত সম্পত্তির দানপত্র লিখিয়ে নেবার আয়োজন করেন। অবিলম্বে দানপত্র রচিত হল। দুজন বিধবা নির্দিষ্ট মাসিক বৃত্তি পাবেন, ব্রত পূজাদি ধর্মকার্যের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ পাবেন, এই ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ হল। কিন্তু বিধবাদ্বয় কিছুতেই দানপত্রে সই দিতে সম্মত হননি।[৩৮] তার ফলে মোকদ্দমা আরম্ভ হল। লর্ড হেস্টিংস তখন ভারতের গভর্নর জেনারেল। রত্নমালা ও নারায়ণী দেবী পতির প্রাপ্য ময়মনসিংহ ও জফরসাহি পরগনার অংশ প্রাপ্তির জন্য কলিকাতার রাজস্ব সমিতিতে যুগলকিশোর রায়ের নামে অভিযোগ করেন। রত্নমালা ও নারায়ণী দেবীকে যুগলকিশোরের অধিকৃত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির অর্ধাংশ দেবার আদেশ প্রদান করা হল। তাঁদের নামে জমিদারির সনদও বের হল। বিধবাদের অধিকার স্বীকার করে যথারীতি ব্যবস্থা করার জন্য ঢাকার কর্মচারীদের নির্দেশ দেওয়া হল। ওয়ারেন হেস্টিংস রত্নমালা ও নারায়ণী দেবীকে নিজ সাক্ষরিত একটি সনদ-পত্র প্রদান করেন।[৩৯] বাংলা ১১৮৪ সন থেকে রত্নমালা ও নারায়ণী দেবীর নামে জমিদারি চলতে লাগল। তাঁরা যুগলকিশোরের অধিকৃত সম্পত্তির অর্ধাংশের অধিকারিণী হন। তাঁরা সাহস করে গৌরিপুরে আসতে পারেননি। তাঁরা রামপুর বোয়ালিয়াতে বাস করতেন। রামগোপালপুরে বাড়ি নির্মাণ করে সেখানে বাস করতে লাগলেন। বাংলা ১১৯১ সনে রত্নমালা দেবী মারা যান। নারায়ণী দেবী সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হন। তাতে আবার বিবাদের সূত্রপাত হল। মোকাদ্দমা কলকাতা সদর দেওয়ানি আদালত পর্যন্ত চলে। অবশেষে নারায়ণীই প্রকৃত উত্তরাধিকারী হন।[৪০] নারায়ণী দেবী দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন। যুগলকিশোর আপত্তি করেন। এই নিয়ে বিবাদ দেখা দেয়। নারায়ণী দেবী আদালতের আশ্রয়

BanglaBook.org

গ্রহণ করে সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হন। যুগলকিশোর সাফল্য লাভ করতে পারেননি।[৪১] দীর্ঘকাল ধরে মামলা মোকদ্দমা চলায় বোঝা যায় এই জমিদারির বিধবারা যুগলকিশোর সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন। যে-কোনো ভাবেই হোক তিনি যে মুসলমান সেই আঁচ তাঁরা করেন। সুতরাং যুগলকিশোর তাঁর বিপদের কথা উপলব্ধি করতে পারেন। এই অবস্থায় তিনি যে সিদ্ধান্ত নেন সে আলোচনা আমরা পরে করব। তিনি গৌরীপুর জমিদারির সমৃদ্ধির জন্য যে দায়িত্ব পালন করেন সে বিষয়ে অনেক তথ্যই জানা যায়। *ময়নমসিংহের ইতিহাস* গ্রন্থে তা উল্লিখিত রয়েছে।

প্রথম দিকে যুগলকিশোর রাজশাহি পাকুড়িয়া গ্রামের বিখ্যাত শক্তি সাধক পণ্ডিত মোহন মিশ্রের কাছে কালীমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে শক্তিসাধনা করেন। ১৭০৭ শকাব্দে বোকাইনগরে শ্রী শ্রী রাজরাজেশ্বরী কালীমাতা এবং দ্বাদশটি শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। ময়নমনসিংহের অনেক জায়গায় কালীমন্দির ও শিবলিঙ্গ তাঁর প্রচেষ্টাতেই স্থাপিত হয়। তিনি নেত্রকোনায় একটি কালীমূর্তি ও জাফরশাহিতে রাধামোহন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। গৌরীপুরে ও জমিদারির বিভিন্ন স্থানে তাঁর প্রতিষ্ঠিত জলাশয় এখনও তাঁর 'পরার্থপরতার মহিমা বিস্তার' করছে। জাফরশাহি পরগনার যুগলকুঞ্জ নামে তাঁর প্রতিষ্ঠিত একটি গ্রাম তাঁকে অমর করে রেখেছে। তিনি ১২১৬ বঙ্গাব্দে সমারোহের সাথে 'নবাগ্নিযাগ' করেন। এই যাগে দেশ বিদেশের বহু পণ্ডিত সমবেত হয়ে তাঁর সুখ্যাতি করেন। তাঁর সৌজন্য ও বিনীত ব্যবহারে এবং দানশীলতায় জনসাধারণের শ্রদ্ধা অর্জন করতে সক্ষম হন।[৪২]

তা সত্ত্বেও জমিদারিতে মামলা-মোকদ্দমার ফলে তিনি ভয়ানক বিপন্ন হন। দত্তকপুত্র হিসেবে যখন তাঁর অধিকার ক্ষুণ্ণ হয় তখন তিনি বিপদের আশঙ্কা করেন। যুগলকিশোরের গায়ের রং, সুঠাম দেহ সাধারণ বাঙালিদের মতো ছিল না। পরিবারের বিধবারা যখন শত্রুভাবাপন্ন হয়ে তাঁকে বিজাতীয় বলে মনে করতে থাকেন তখন যুগলকিশোর ভয়ানক বিপদের সংকেত পান। তাঁকে ইংরেজ কোম্পানির ব্রিটিশ প্রশাসকদের কাছে মুসলমান বলে ধরিয়ে দিতে পারেন এমন আশঙ্কা তাঁর হয়। স্বভাবতই তিনি গৌরীপুর জমিদারি ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন। এই সময়ে তিনি শ্রীহট্ট জেলায় গিয়ে গোপনে আত্ম গোপন করার কথা ভাবেন। যুগলকিশোর ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত যাপুর গ্রামের ভট্টাচার্য বংশের রুদ্রাণী দেবীকে বিবাহ করেন এবং তাঁরই গর্ভে হরকিশোর

BanglaBook.org

ও শিব কিশোর নামে দুই পুত্র এবং অন্নদা, বরদা, মোক্ষদা ও মুক্তিদা নাম্নী চার কন্যা জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু শিবকিশোর অল্প বয়সেই মারা যায়।[৪৩] যুগল কিশোরের পুত্র হরকিশোর রায়চৌধুরী শ্রীহট্ট জেলায় বংশীকুণ্ড নামক বিস্তৃত জমিদারি ক্রয় করেন। এই স্থানে বন্য হস্তী ধরার সুবিধা ছিল। অনেক হস্তী ধরে হস্তী সম্পদ বৃদ্ধি করা হয়। কিন্তু তাঁর পক্ষে একই সঙ্গে গৌরীপুরের জমিদারি দেখাশুনা করা এবং শ্রীহট্ট জেলার বিস্তৃত জমিদারি পরিচালনা করা সম্ভব না হওয়ায় তিনি শ্রীহট্ট জেলার জমিদারি বিক্রি করে দেন।[৪৪]

হরকিশোর রায়চৌধরি একটি বৃহৎ দালান নির্মাণ করে গৌরীপুরের বাড়ির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেন। তিনি রাজশাহি জেলার অন্তর্গত বৃকুৎসা গ্রাম নিবাসী কাশীনাথ মজুমদারের কন্যা ভাগীরথী দেবীকে বিবাহ করেন। তাঁর কৃষ্ণমণি দেবী নামে কন্যা ব্যতীত অন্য কোনো সন্তান ছিল না। কৃষ্ণমণির শৈশবকালেই হরকিশোর মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সমস্ত সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের তত্ত্বাবধানে কিছুদিন পরিচালিত হয়। ভাগীরথী দেবী এক দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন। তাঁর নাম ছিল আনন্দকিশোর রায়চৌধুরি। কিন্তু এই দত্তক পুত্রের 'উচ্ছৃঙ্খলতা ও অপব্যয় স্পৃহা' লক্ষ করে ভাগীরথী দেবী খুবই মর্মাহত হন। তাই ভাগীরথী দেবী এই পুত্রে জমিদারিভার অর্পণ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় পরিবারে বিরোধ দেখা দেয়। অবশেষে সমস্ত সম্পত্তি সমান দুই অংশে বিভক্ত করা হল। এক অংশ ভাগীরথী দেবীর হাতে রইল এবং অপর অংশ আনন্দকিশোরের থাকল।[৪৫]

ভাগীরথী দেবী তাঁর কন্যা কৃষ্ণমণি দেবীর বিয়ে দিয়ে গৌরীপুরের নিকটে কন্যা-জামাতার জন্য বাসভবন নির্মাণ করে দেন। ওই বাসস্থান কন্যার নাম অনুসারে কৃষ্ণপুর নামে উল্লিখিত হয়। অল্পদিনের মধ্যেই কৃষ্ণপুর বিশেষ সমৃদ্ধি সম্পন্ন হয়। কিন্তু বিয়ের অল্পদিন পরেই কৃষ্ণমণি দেবীর স্বামী মারা যান। কৃষ্ণমণি দেবী দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন। কৃষ্ণমণি দেবীর জীবিতকালেই এই দত্তক পুত্র মারা যান। দারুণ শোকে আচ্ছন্ন হয়ে কৃষ্ণমণি দেবী কাশীবাসিনী হন। ভাগীরথী দেবীও তীর্থ ভ্রমণকালে ১২৭০ সালে মারা যান।[৪৬] গৌরীপুরে যুগলকিশোরের বংশের ধারাটি ভাগীরথী দেবীর দত্তক পুত্র আনন্দকিশোর রায়চৌধুরির মাধ্যমে প্রবহমান থাকে।[৪৭] তাই যুগলকিশোরের বংশের ধারাটি খুঁজতে এবার শ্রীহট্টের দিকে দৃষ্টিপাত করতে হয়। সে কথাই আমি বলার প্রয়াস করব। পূর্বেই যুগলকিশোরের প্রথম স্ত্রী রুদ্রাণী দেবীর কথা বলা হয়েছে। রুদ্রাণী দেবীর দুই পুত্রই অল্প বয়সে মারা যান। রুদ্রাণী

দেবীর কোনো পুত্র সন্তান না থাকায় যুগলকিশোর পুনরায় বিবাহ করেন। তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম ছিল যমুনা দেবী। তিনি ছিলেন পাবনার পাকুরিয়া গ্রামের গঙ্গাময়ী দেবীর বোন। যুগলকিশোর ও যমুনা দেবীর প্রাণকৃষ্ণনাথ নামে এক পুত্র ছিল। যুগলকিশোর যখন ময়নমনসিংহ থেকে সিলেটে যান তখন এই স্ত্রী ও পুত্র তাঁর সঙ্গে ছিল। তাঁদের নিয়ে তিনি সিলেটের কাজল শহর (Kajal Sahar) নামক জায়গায় যান। এই অঞ্চল কাজলশা (Kajalsha) নামেও পরিচিত। জলা অঞ্চল ছিল বলে কাজলহোর (Kajalhoar or Waterbodies) বলা হয়। এখানে যুগলকিশোর বিস্তৃত জমিদারি ক্রয় করে বসবাস শুরু করেন। কাজল শহরে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপনের পর যুগলকিশোরের এক ভিন্ন জীবন শুরু হয়। তিনি কারও সঙ্গে মিশতেন না। সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ অবস্থায় ছিলেন। গৌরীপুরে থাকাকালীন তাঁর যে দাপট ছিল, তার বিন্দুমাত্র এখানে ছিল না। যুগলকিশোরের ফরসা রং ও দেহের গড়ন দেখে পাঞ্জাবী বলে মনে হত। যুগলকিশোরের শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী কাজল শহরের পরিবারিক জমিদারিতে একান্ত গোপনে তাঁর মর দেহ কবর দেওয়া হয়। এই ইচ্ছা তিনি তাঁর পুত্র প্রাণকৃষ্ণ নাথের কাছে ব্যক্ত করেন এবং তাঁর জন্মবৃত্তান্ত বলেন। যুগলকিশোর সিরাজ-উদ্‌দৌলার পুত্র এবং তাঁর মায়ের নাম হল হীরা (ধর্মান্তরিত হয়ে আলেয়া হন), এই খবরে পুত্র প্রাণকৃষ্ণ নাথ ভয়ানক বিস্মিত হন। ব্রিটিশ শাসনকালে এই সংবাদের গোপনীয়তা বজায় রাখা সম্পর্কেও পুত্রকে তিনি বিশেষভাবে সচেতন করেন। তিনি এই পরামর্শও দেন ভবিষ্যতে তাঁর বংশধরদের সবাই যেন সিলেটে না থেকে একটি অংশ পদবী পরিবর্তন করে শিলং-এ চলে যান। সকলে এক জায়গায় থাকলে বিপন্ন হবার সম্ভাবনা থাকবে। এই শতর্কবাণী তিনি উচ্চারণ করেছিলেন। ১৮১১-১৮১২ খ্রিস্টাব্দের কোনো একটি বছরে যুগলকিশোর কাজল শহরে প্রয়াত হন এবং সেখানেই তাঁর জমিদারিতে গোপনীয়তা অবলম্বন করে প্রাণকৃষ্ণনাথ তাঁকে সমাধিস্ত করেন।[৪৮] *ময়মনসিংহের ইতিহাস* গ্রন্থে যুগলকিশোরের প্রয়াণ সম্পর্কে যেভাবে লেখা হয়, তা আমি এখানে উদ্ধৃত করছি

> যুগলকিশোর যশ ও প্রতিপত্তির সহিত জমিদারি কার্য পরিচালনা ও বিবিধ ধর্মকার্যের অনুষ্ঠানপূর্বক আনুমানিক ১২১৮-১২১৯ সালে ইহলোক ত্যাগ করেন।[৪৯]

BanglaBook.org

কিন্তু কোথায় যুগলকিশোর প্রয়াত হন সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট করে এই গ্রন্থে কোনো কথা বলা হয়নি। অনেক অনুসন্ধান করে আমি জানতে পেরেছি যুগলকিশোরের শেষ দিনগুলি কাজল শহরেই কাটে। এই বিষয়ে যুগলকিশোরের প্রত্যক্ষ বংশধরদের অপ্রকাশিত কাগজপত্র থেকেও তার সমর্থন পাই।[৫০]

যুগলকিশোরের পুত্র কৃষ্ণনাথ রায়চৌধুরী সিলেটের উন্নতির জন্য অনেক কাজ করেছেন। তিনি সিলেটে লেক তৈরি এবং যুগল টিলা আখড়া (Jugal Tila Akhra) নির্মাণ করতে জমিদান করেন। এখন যুগল টিলা আখড়াতে ইস্কনের মস্ত বড়ো কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে।[৫১] প্রাণকৃষ্ণনাথের প্রথম পুত্র কাজল ১২ বছর বয়সে মারা যায়। তাঁর দ্বিতীয় পুত্র হলেন শৌরীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী। শৌরীন্দ্রকিশোরের সঙ্গে বিপ্লবী দলের যোগাযোগ ঘটায় ব্রিটিশ প্রশাসকদের কাছে তিনি সন্দেহভাজন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর পিতার পরামর্শে তিনি বিপ্লবীদের সঙ্গে আর যোগাযোগ রাখেননি। কৃষ্ণনাথ রায়চৌধুরী তাঁর পিতার পরিচয় তাঁকে খুলে বলেন। এই কারণে এমন কিছু করা উচিত নয় যাতে সমস্ত পরিবারই বিপন্ন হয়ে পড়বে। গোপনীয়তা রক্ষা করেই তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে চলছেন। শৌরীন্দ্রকিশোর পরিবারের অবস্থা উপলব্ধি করতে পারেন। তিনি দুবার নাম পরিবর্তন করে এই অবস্থা থেকে অব্যাহতি লাভ করেন এবং পড়াশুনায় নিমগ্ন হন। শৌরীন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী থেকে প্রথমে হন প্রসন্ন চন্দ্র রায়চৌধুরী, পরে নাম পরিবর্তন করে হন প্রসন্ন কুমার দে। সুতরাং শৌরীন্দ্রকিশোর, প্রসন্ন চন্দ্র ও প্রসন্নকুমার একই ব্যক্তি ছিলেন।[৫২]

তিনি প্রসন্নচন্দ্র রায়চৌধুরী নামে কলকাতার হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। এই কলেজের ছাত্র হিসেবে ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি জুনিয়র স্কলারশিপ লাভ করেন। এই কলেজ থেকেই তিনি বি. এ. ডিগ্রি লাভ করেন। এমন একটি সময়ে যখন কিছুদিনের মধ্যেই এই কলেজ প্রেসিডেন্সি কলেজে রূপান্তরিত হয়। আমি এখানে Presidency College Registar থেকে যে তথ্য পেয়েছি তা এখানে উল্লেখ করছি।[৫৩] প্রেসিডেন্সি কলেজে রূপান্তরিত হবার পরে তাঁর সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পরিচয় হয়েছিল কিনা সে সম্পর্কে কোনো খবর জানা যায় না। তবে বঙ্কিমচন্দ্র প্রয়াত হবার পরে প্রসন্নকুমার দে ইংরেজিতে যে কবিতাটি রচন করেন তার শিরোনাম ছিল 'Is Bankim Dead?' তিনি লেখেন

BanglaBook.org

What Bankim dead!–a fool alone
can credance give to such a lie;
With poet's unfading laurel on,
I see him now as e'er did I.
He can not die, like mighty Vyas
Must he immortal live and shine,
Or as doth noble Kalidas,
The best of Vikram's favoured Nine.
He sings: e'en now I hear his song
That sweet enchanting lyric note
In diverse tune enduring long;
And sit all ear in rapture mute.
Great Bankim lives, and live shall he,
While Hist'ry holds a voice on earth,
And add new grace invisibly
To beauties he has given birth.[৫৪]

প্রেসিডেন্সি কলেজের রেজিস্টার থেকে মনে হয় তিনি বঙ্কিমের পরিচিত না থাকলেও তাঁকে দেখেছেন এবং বঙ্কিমের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। বঙ্কিম প্রয়াত হওয়ার পর আর কোনো বাঙালি ইংরেজিতে কবিতা রচনা করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন কিনা তা আমার জানা নেই। সিরাজউদ্‌দৌলার প্রত্যক্ষ বংশধর প্রসন্নচন্দ্র রায়চৌধুরী যে কবিতা আমাদের উপহার দিয়েছেন তাকে এক ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। কবিতাটি পড়ে মনে হয় তাঁর সঙ্গে বঙ্কিমের পরিচয় থাকতেও পারে।

পিতার কাছ থেকে যুগলকিশোরের জীবন বৃত্তান্ত শোনার পর শৌরীন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী বোকাইনগর গ্রামে যান। পলাশির যুদ্ধে বিপর্যয়ের পরে মোহনলাল সিরাজ পুত্রকে নিয়ে এখানেই প্রথম পালিয়ে এসেছিলেন। এই গ্রাম সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করে শৌরীন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী 'বোকাই নগরের ইতিবৃত্ত' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধটি জাহ্নবী নামে বিখ্যাত মাসিক পত্রিকায় বাংলা ১৩১৫ সালের পৌষ মাসের সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। তারপর তিনি ময়মনসিংহ জমিদারিতে যুগলকিশোরের ভূমিকা নিয়েও যে আলোচনা করেন তা ১৩১৬ সালের অগ্রহায়ণ মাসের ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটির শিরোনাম ছিল 'যুগল কিশোরের দস্যু-দমন ও বিচার ফল'। তখন *ভারতী পত্রিকা*-র

সম্পাদক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। *ময়মনসিংহের ইতিহাস* গ্রন্থ রচনাতেও তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল।[৫৫] বিশ শতকের প্রারম্ভেই উপরে উল্লিখিত দুটি প্রবন্ধ ও ইতিহাস গ্রন্থ রচিত হয়।

আমি পূর্বেই লিখেছি শৌরীন্দ্রকিশোর, প্রসন্নচন্দ্র রায়চৌধুরী ও প্রসন্নকুমার দে একই ব্যক্তি। প্রসন্নকুমারের তিন স্ত্রী ছিল। তাঁর প্রথম স্ত্রী ত্রিপুরেশ্বরী দেবীর উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী নামে এক পুত্র ছিল। এই স্ত্রী হঠাৎ সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে মারা যান। তাঁর স্ত্রীর পিতার বাড়ির লোকেরা সন্দেহ করেন প্রসন্নকুমারই এই মৃত্যুর জন্য দায়ী এবং তাঁর বিরুদ্ধে থানায় ডায়েরি করা হয়। তাঁরা উপেন্দ্রকিশোরকে সেখান থেকে নিয়ে যান। উপেন্দ্রকিশোর বরিশালে বড়ো হন। তদন্ত করে পুলিশ এই মৃত্যুকে আকস্মিক দুর্ঘটনা মনে করে প্রসন্নকুমারকে বিব্রত করেনি। তিনি আবার বিবাহ করেন। তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী মোহিনীর দুই পুত্র ও এক কন্যা ছিল। তাঁর প্রথম পুত্রের নাম নলিনী কিশোর, পরে তাঁর নাম পরিবর্তন করে বিজয়কুমার করা হয় এবং দ্বিতীয় পুত্রের নাম হেমন্তকুমার। ইতিমধ্যে প্রসন্নকুমারের প্রথম স্ত্রীর ভাই পুলিশ বিভাগে যোগদান করে সিলেট শহরে বদলি হয়ে আসেন। তিনি এসেই তাঁর বোনের সন্দেহজনক মৃত্যুর মামলাটি শুরু করার ব্যবস্থা করে প্রসন্নকুমারকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করেন। এই অবস্থায় প্রসন্নকুমার কাজলশার জমিদারি ম্যানেজারের দায়িত্বে দিয়ে রাতারাতি ওই স্থান ত্যাগ করে সুরমা নদীর পাড়ে সুনামগঞ্জে জমিদারি কিনে সেখানে চলে যান এবং এই জমিদারি পরিচালনার দায়িত্ব তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী ও পুত্র বিজয়কুমারকে দেন। এই সময়ে তিনি প্রসন্নচন্দ্র রায়চৌধুরী নাম পরিবর্তন করে প্রসন্নকুমার দে হন। গ্রেফতার হতে পারেন এই আশঙ্কায় দু-বছর তাঁকে আত্মগোপন করে থাকতে হয়। তিনি যাঁকে কাজশালার জমিদারি পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে যথাসময়ে খাজনা না দেওয়ায় 'সূর্যাস্ত আইনে' জমিদারি নিলামে যায় এবং তিনিই জমিদারির মালিক হয়ে বসেন। কিন্তু এই ম্যানেজারের পক্ষে এই জমিদারি ভোগ করা সুখের হয়নি। তাঁর পরিবারের সবাই নানা অসুখে মারা যান, তিনিই একমাত্র জীবিত থাকেন। ইতিমধ্যে প্রসন্নকুমার বিপদ মুক্ত হন। ওই ম্যানেজার তাঁর কাছে এসে ক্ষমা প্রার্থনা করেন তাঁর অন্যায় কাজের জন্য। প্রসন্নকুমার তাঁকে ক্ষমা প্রদর্শনের পর বলেন, তাঁর পারিবারিক বিপর্যয় তাঁর বিশ্বাসঘাতকতার জন্যই হয়েছে। কাজলশা জমিদারি হাতছাড়া হয়ে

BanglaBook.org

যাওয়ার বেদনা প্রসন্নকুমার কখনই ভুলতে পারেননি। তার জন্য সবসময়ে তিনি নিজেকেই দায়ী করেন।[৫৬]

প্রসন্নকুমারের দ্বিতীয় স্ত্রী মারা যাওয়ার পর তিনি আবার বিবাহ করেন। এই তৃতীয় স্ত্রী হিরন্ময়ীর গর্ভে ছয়টি পুত্র ও একটি কন্যার জন্ম হয়। পুত্রদের নাম ছিল পূর্ণেন্দুকুমার, ঘনেন্দু, নীরেন্দু, শরদিন্দু, প্রশান্ত ও নওয়ালকুমার। প্রসন্নকুমার সুনামগঞ্জে 'জুবিলি স্কুল' (Jubilee School) নামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। পরে তাতে মাধ্যমিক বিভাগ যুক্ত হওয়ায় তার কলেবর বৃদ্ধি পায়। তিনি তার অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় হিসেবে 'জুবিলি স্কুল' যথেষ্ট সুনাম অর্জন করে। সুনামগঞ্জে প্রথম প্রিন্টিং প্রেস স্থাপন করার কৃতিত্বও প্রসন্নকুমার দের। প্রেসের নাম ছিল 'জুবিলি প্রেস' (Jubilee Press)।[৫৮] প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, যুগলকিশোর রায়চৌধুরী তাঁর পরিচালিত ময়মনসিংহ জমিদারিতে 'বোকাইনগর হইতে নিজ বাটি পর্যন্ত দুই ধারে দেবদারু বৃক্ষ রোপণ করিয়া একটি রাস্তা প্রস্তুত করিয়াছিল।'[৫৯] এই রাস্তাটি জুবিলি রোড নামে পরিচিত। যুগলকিশোরের প্রত্যক্ষ বংশধর সুনামগঞ্জে স্কুল ও প্রেস প্রতিষ্ঠা করে জুবিলি নাম ব্যবহার করেন। সুনামগঞ্জের জুবিলি স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল প্রসন্নকুমার দে কবি হিসেবেও খ্যাত ছিলেন। তিনি *Indian Bouquet* নামে ইংরেজিতে যে কবিতা গ্রন্থ রচনা করেন তার দুটি কবিতা সম্প্রতি আমেরিকায় প্রকাশিত *Book of Poets of Undivided Bengal* গ্রন্থেও স্থান পেয়েছে, এই গ্রন্থের শিরোনাম হল *Mapping the Nation*।[৬০] ভারত সম্পর্কে প্রসন্নকুমারের গৌরববোধ ছিল, তা এই গ্রন্থে প্রকাশিত কবিতায় লক্ষ করা যায়। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রয়াত হওয়ার পর তিনি তাঁর সম্পর্কে একটি কবিতা ও ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে শিকাগো শহরে স্বামী বিবেকানন্দের ধর্মমহাসম্মেলনে যোগদান সম্পর্কে আর একটি কবিতা লিখেছিলেন। অবশ্য তাঁর দুটো কবিতা এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অসমের চিফ কমিশনার স্যার হেনরি জন স্টেডম্যান কটন (১৮৮৬-১৯০২) সম্পর্কে প্রসন্নকুমার দে কবিতা রচনা করেন তাতে কটনকে 'ভারতবন্ধু' বলা হয়। হেনরি কটনের সঙ্গে প্রসন্নকুমারের সুসম্পর্ক ছিল। প্রসন্নকুমার দে *The Peacock Lute* নামে ইংরেজিতে আর একটি কাব্যগ্রন্থও লিখেছিলেন। কিন্তু এই গ্রন্থটি খুঁজে পাওয়া যায়নি।[৬১]

BanglaBook.org

প্রসন্নকুমার দে তাঁর বংশধরদের জন্য যেসব তথ্য রেখে যান তাতে এই বংশধারা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা করা যায়। তিনি সুনামগঞ্জের একজন সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সেখানকার বিভিন্ন সভায় ও অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হতেন। তিনি ১৯২০-১৯২১ খ্রিস্টাব্দে সুনামগঞ্জে প্রয়াত হন। তাঁর তখন বয়স হয়েছিল ৮৪-৮৫ বছর। তিনি মারা যাবার পর তাঁর পুত্র বিজয়কুমার দেকে সংসারের দায়িত্ব নিতে হয়।[৬২] বিজয়কুমার সিলেটেই জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে সুনামগঞ্জ থেকে শিলং চলে যান। তখন তাঁর পদবিও পরিবর্তিত হয়। তিনি বিজয় কুমার দের পরিবর্তে হন লালা বিজয়কুমার দে। তিনি কলকাতার স্বটিশচার্চ কলেজ এবং গৌহাটির কটন কলেজে পড়াশুনা করেন। বিজয়কুমার কলকাতা থেকে আইনের ডিগ্রি লাভ করে শিলং-এ ওকালতি আরম্ভ করেন। তিনি শিলং বার অ্যাসোসিয়েশন-এর পাঁচ বছর সভাপতি ছিলেন।[৬৩] ওকালতিতে তিনি খুবই সাফল্যলাভ করেন। তিনি ক্রমশ বৃহৎ পরিবারের প্রায় সবাইকে দেশভাগের পূর্বে অসম ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে বসবাসের ব্যবস্থা করে দেন।[৬৪] অবশ্য তাঁর কয়েকজন ভাই সুনামগঞ্জে থেকে যান। এ বার তাঁদের কথা আমি আলোচনা করব।

আমি পূর্বেই প্রসন্নকুমার দে তৃতীয়বার বিয়ে করার পর তাঁর তৃতীয় স্ত্রীর গর্ভে যে-সব সন্তানেরা জন্মগ্রহণ করেন তাঁদের কথা উল্লেখ করেছি। তাঁদের মধ্যে নওয়াল কুমার দে বাদে সব সন্তানেরাই সুনামগঞ্জে থেকে গিয়েছিলেন। তাঁর চতুর্থ পুত্র শরদিন্দু দে, যিনি বুনি বাবু নামে পরিবারের সকলের নিকট পরিচিত ছিলেন। তিনি ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে যখন নবম শ্রেণির ছাত্র ছিলেন তখন মহাত্মা গান্ধী পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন এবং তখন থেকেই তাঁর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী কার্যক্রম প্রকাশ্যে শুরু হয়। তিনি লাঠি খেলায় দক্ষ ছিলেন। তাঁর প্রভাবেই এই পরিবারে প্রত্যক্ষভাবে ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের ভাবধারা প্রবেশ করে। মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক আন্দোলন আরম্ভ করার আগেই সুনামগঞ্জে একটি বিপ্লবী দল গঠিত হয়। পরে এই দলটি 'তরুণ সংঘ' নামক একটি বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত হয়। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ব্রিটিশ আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম সংগঠিত করা। এই বিপ্লবী দলের নেতা ছিলেন শরদিন্দু দে, দেবেন্দ্র চন্দ্র দত্ত, চিত্তরঞ্জন দাস, শরদিন্দুর ছোটো ভাই প্রশান্ত দে, দীনেশ চৌধুরী, প্রচেতা শর্মা, বিনয় চৌধুরী,

pathagar.net

উমেশ শ্যাম, গিরিজা কুমার ভদ্র, রোহিনী কুমার দাম, প্রমোদ চন্দ্র এস, অঙ্গিরা কুমার শর্মা ও বেনু বিনোদ চৌধুরী। এইভাবে সুনামগঞ্জে বিপ্লবী আন্দোলনের সূচনা হয়। অবশ্য এই দলের অন্যতম নেতা ছিলেন শরদিন্দু দে, দীপেশ চৌধুরী, চিত্তরঞ্জন দাস ও বিনয় চৌধুরী।[৬৫] তখন থেকেই সুনামগঞ্জে বিপ্লবী দল গড়ে ওঠে। বিপ্লবী দলের নেতা ও কর্মীরা মহাত্মা গান্ধী পরিচালিত অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করে কারাবরণ করায় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামও শক্তিশালী হয়। শরদিন্দু দে ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানের পর আর বিদ্যালয়ে ফিরে যাননি। উল্লেখ্য, তিনি জুবিলি স্কুলের ছাত্র ছিলেন। তিনি ১৯৩০-১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করে কারাবরণ করেন। বিপ্লবী আন্দোলনে থাকাকালীন তিনি সুনামগঞ্জে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা তখন কংগ্রেসেরও সদস্য ছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টি কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত শরদিন্দু দে সুনামগঞ্জ মহকুমা কংগ্রেসের সম্পাদক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। তিনিই সুরমা উপত্যকা কৃষক সমিতির সম্পাদক ছিলেন। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে কমিউনিস্ট পার্টির শ্রীহট্ট জেলা সাংগঠনিক কমিটি ছয়জন সদস্যকে নিয়ে গঠিত হয়। তাঁরা হলেন চিত্তরঞ্জন দাশ, দিগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, শরদিন্দু দে, দীপেশ চৌধুরী, চঞ্চল কুমার শর্মা ও অমরেন্দ্র দাশ।[৬৬]

আমি আগেই লিখেছি, প্রশান্তকুমার দে সুনামগঞ্জ বিপ্লবী দলের একজন নেতা ছিলেন। তিনি সুনামগঞ্জের জুবিলি স্কুল থেকে পড়াশুনা করে সিলেটের মুরারী চাঁদ কলেজ থেকে গ্রাজুয়েট হন। তারপর এলাহাবাদে ডিফেন্স অর্ডিনেন্স অরগানাইজেশনে যোগদান। এই সময়ে তিনি বিবাহও করেন। মহাত্মা গান্ধী পরিচালিত আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদানের জন্য তিনি চাকরি থেকে পদত্যাগ করে সুনামগঞ্জে এসে আন্দোলনে যোগদান করেন। এই সময় তিনি সিলেট ও জোরহাট জেলে ছিলেন। তিনি ১৯৩৫-১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে মুক্তিলাভ করেন।[৬৭] ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্ট ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগ হল। ভারতের পশ্চিম প্রান্তে পশ্চিম পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং বেলুচিস্তান এবং পূর্ব প্রান্তে পূর্ব বাংলা ও অসমের শ্রীহট্ট জেলা নিয়ে স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হয়, একই সঙ্গে স্বাধীন ভারতীয় ইউনিয়ন গঠিত হল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও শ্রীহট্ট জেলার ভাগ্য গণভোটের মাধ্যমে পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত

BanglaBook.org

হল। এই রাজনৈতিক অবস্থার সঙ্গে প্রশান্তকুমার দে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেননি। তিনি রাজনীতি ছেড়ে দিয়ে প্রথমে স্ট্যান্ডার্ড ফারমাসিউটিক্যালস এবং পরে গ্লুকোনেট লিমিটেডে যোগদান করেন। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি তিনসুকিয়াতে থেকে অসমের করিমগঞ্জে চলে যান।[৬৮]

১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে শ্রীহট্ট জেলার সমস্ত কমিউনিস্টদের পাকিস্তান সরকার কারাগারে আবদ্ধ করে। এই সময়ে অন্য সকল পার্টি সদস্যদের সঙ্গে শরদিন্দু দেও বন্দি হন। তাঁর স্ত্রী সুষমা (পুরকায়স্থ) দেও শ্রীহট্ট জেলার নানকার আন্দোলনের নেত্রী হিসেবে গ্রেফতার হন ও পুলিশি নির্যাতনের শিকার হন। শরদিন্দুকে পাকিস্তানের বিভিন্ন জেলে ভয়ানক নির্যাতন সহ্য করতে হয়। দীর্ঘবাইশ বছর তাঁদের কখনও কারাগারে অথবা আত্মগোপন করে পার্টির কাজ করতে হয়। ভারতে চলে যাবেন এই শর্তে তাঁদের দুজনকে মুক্তি দেওয়া হয়। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে শরদিন্দু ও সুষমা ভারতে চলে আসেন। শারীরিক দিক থেকে দুজনেই তাঁরা ভয়ানক বিধ্বস্ত। তখন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন কমিউনিস্ট নেতা নৃপেন চক্রবর্তী। তিনি শরদিন্দু দে ও সুষমা পুরকায়স্থকে জানতেন। শ্রীহট্টের কমিউনিস্ট আন্দোলনে তাঁদের ভূমিকার সঙ্গেও তিনি পরিচিত ছিলেন। নৃপেন চক্রবর্তীর সঙ্গে শরদিন্দুদের বন্ধুত্ব ছিল। তাই শরদিন্দু মুক্ত হয়েই নৃপেন চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা করেন। নৃপেন চক্রবর্তী আগরতলার কাছে তাঁদের বসবাসের জন্য এক টুকরো জমি দেন। সেখানে একটি গৃহ নির্মাণ করে শরদিন্দু তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। তাঁদের দুজনের শরীর দীর্ঘকাল জেলে থাকার ফলে খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তাঁদের জীবনের শেষ দিনগুলি এখানেই অতিবাহিত করেন। ইতিহাসের পরিহাস এই নৃপেন চক্রবর্তী কখনই জানতে পারেননি যে সিরাজউদ্‌দৌলার প্রত্যক্ষ বংশধরকে তিনি তাঁর শেষ জীবনে আশ্রয় দিয়েছেন। ভারতের মুক্তি যজ্ঞে এমনি করেই শরদিন্দু দে নিজের জীবন উৎসর্গ করেন। ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসে শরদিন্দুকে এক উজ্জ্বল আত্মত্যাগী চরিত্র হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।[৬৯]

আমি আগেই লিখেছি লালা বিজয়কুমার দে সিরাজপুত্র যুগলকিশোর রায়চৌধুরীর প্রত্যক্ষ বংশধর। কিন্তু তিনি এই খবরটি একান্তই গোপন রাখেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর নাতি লালা অজয় কুমার দে শিলং-এ থাকতেন। তিনি ছিলেন বিজয়কুমারের আদরের নাতি। বিজয়কুমার মারা যাবার পূর্বে তাঁর দৌহিত্র লালা অজয়কুমার

BanglaBook.org

দে-কে সিরাজউদ্‌দৌলার বংশের ধারাটি সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য উল্লেখ করেন। স্বভাবতই লালা অজয়কুমার দে ভয়ানক বিস্মিত হন। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি এই তথ্যটি জানার পরেও পরিবারের অন্যান্যদের কাছে তা ব্যক্ত করেননি। তিনি এই তথ্যের রাজনৈতিক ও সামাজিক গুরুত্ব উপলব্ধি করে গোপনীয়তা বজায় রাখেন। তাঁর ঠাকুর্দার নির্দেশ মতো লালা অজয়কুমার দে তথ্যসমূহ দীর্ঘকাল সযত্নে সংরক্ষণ করেন। পরে সুবিধামতো সময়ে পরিবারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের কাছে এই তথ্য ব্যক্ত করেন এবং তাঁদের গোপনীয়তা বজায় রাখতে বলেন। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের ২৩ ডিসেম্বর লালা বিজয় কুমার দে গুয়াহাটিতে মারা যান।[৭০]

তিন বছর আগে এই সংবাদটি লালা অজয়কুমার দে-র কাছ থেকে আমি সংগ্রহ করতে পেরেছি। তিনি তাঁর কয়েকজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় নিয়ে আমার সঙ্গে কলকাতায় এসে দেখা করেন এবং তাঁরা আমাকে আমার গবেষণায় সর্বপ্রকার সাহায্য করতে সম্মত হন। লালা অজয়কুমার দে আমাকে পারিবারিক তথ্যসমূহ ব্যবহারের অনুমতি দেন। লালা দে পরিবারের যে সমস্ত প্রবীণ ব্যক্তি আমাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন অজয় রায় চৌধুরী, লালা বিজন দে, লালা শ্যামল দে, এবং লালা বিষ্ণু দে। তার ফলেই আমার পক্ষে এই অজানা তথ্য প্রকাশ করা সম্ভব হল।[৭১] তাঁদের অনুমতি নিয়েই আমি এই রচনায় তাঁদের নাম প্রকাশ করছি। তাঁরা এখন সবাই হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত এবং হিন্দু ধর্মের রীতি নীতি অনুযায়ী জীবনযাপন করেন। তাই আমার অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল। আমি যুগলকিশোরের প্রকৃত পরিচয় উদ্ধার করতে সক্ষম হলেও অনেক বছর তাঁর প্রত্যক্ষ বংশধরদের চিহ্নিত করতে পারিনি। লালা দে পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ হওয়ার ফলে পলাশি যুদ্ধের হারিয়ে যাওয়া কয়েকটি মূল্যবান তথ্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়া সম্ভব হয়।[৭২] হিন্দু ধর্মের পরিধির মধ্যে যে ঔদার্যবোধের ধারাটি লালা দে পরিবার সযত্নে লালন করেছেন তা বাঙালি সমাজ জীবনে এক স্বতন্ত্র ধারা হিসেবে স্বীকৃতি পাবে। কারণ তাঁরা হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত হলেও অন্য ধর্মাবলম্বীর সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে তাঁদের কোনো অসুবিধা হয়নি। স্বভাবতই ঔদার্যবোধের সংজ্ঞাও নতুন তাৎপর্য পাবে। অলিবার্দি ও সিরাজউদ্‌দৌলার ভাবনাতে যে ধর্মীয় সহনশীলতা ও ঔদার্যবোধের প্রতিফলন ঘটেছিল তারই সহজ স্বাভাবিক প্রকাশ যুগলকিশোর

BanglaBook.org

রায়চৌধুরী ও তাঁর বংশধরদের মধ্যে অব্যাহত থাকায় বাঙালির ভাবনার সীমানা আরও প্রসারিত হবে বলে আমার ধারণা।

এবার মোহনলাল সম্পর্কে যে সব তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছি তা প্রকাশ করছি। আমি পূর্বেই আলোচনা করেছি, মোহনলাল সিরাজউদ্‌দৌলার পুত্রকে ময়মনসিংহের জমিদার বাড়িতে দত্তক রাখার ব্যবস্থা করে অজ্ঞাতবাসে চলে যান। পলাতক অবস্থায় তিনি জানতে পারেন তাঁকে ধরবার জন্য মিরজাফর ও ইংরেজ গুপ্তচরদের বিভিন্ন জায়গায় পাঠানো হয়েছে। তিনি এই সংবাদও পান মিরজাফরের পুত্র মিরন তাঁর পিতার সিংহাসন প্রাপ্তিকে মসৃণ করবার জন্য শত্রুদের হত্যা করার এক দীর্ঘ তালিকা প্রস্তুত করে কয়েকজনকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। তাঁদের মধ্যে মোহনলালের বড়ো ছেলে শ্রীমন্ত লালও ছিলেন। অবশ্য মোহনলালের কনিষ্ঠ পুত্র হুক্কালাল পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হন।[৭৩]

মোহনলালের পলাতক জীবন সম্পর্কে নানা কাহিনি মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, বর্ধমান ও হুগলি জেলার বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে আছে। ঔপনিবেশিক আমলে এই সব কাহিনি সংগ্রহ করা বিপজ্জনক ছিল। তার ফলে আঠারো শতকের গ্রাম বাংলার মোহনলাল সম্পর্কীয় খবর হারিয়ে যায়। যেসব খবর সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে তা নির্ভর করে মোহনলালের জীবনের শেষ দিনগুলি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব নয়। সিরাজের বংশধর লালা দে পরিবারের সূত্রে জানা যায়, মোহনলাল তাঁর ভাগনেকে ময়মনসিংহ জমিদারিতে দত্তক রেখে রংপুরে চলে যান। মোহন লাল ইংরেজ কোম্পানির প্রাধান্য বিস্তারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। তিনি নিজে যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। উল্লেখ্য, নবাব আলিবর্দি ও নবাব সিরাজউদ্‌দৌলার সময় কালে রাজ্যের সেনাবাহিনীতে যাদব সম্প্রদায়ের বহু মানুষ ছিল। সিরাজের পতনের পর তারা নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। যাদব সম্প্রদায়ের দক্ষ লাঠিয়ালদের মধ্য থেকেই সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হত। বাংলা, বিহার ও ওড়িশার মুসলিম সম্প্রদায় থেকেও বহু সৈন্য সংগৃহীত হয়। এই সময়ে তারাও অনেকে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। নবাবের প্রতি বিশ্বস্ত সেনাবাহিনীর বিভ্রান্ত ও বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়া সৈনিকদের বিষয়ে প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করা খুবই কষ্টকর। লালা দে পরিবারের সূত্রে জানা যায়, মোহনলাল তাঁর অনুগামীদের ও মজনুশাহকে নিয়ে ইংরেজ কোম্পানির বিরোধিতা করতে উদ্যোগী হন। উত্তরবঙ্গের, বিশেষ করে রংপুরে, বিস্তীর্ণ অঞ্চ

BanglaBook.org

ল বনজঙ্গলে ভরা ছিল। সুতরাং মোহনলালের পক্ষে এই স্থান দল গড়ার পক্ষে উপযোগী ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে লালা দে পরিবারের প্রসন্ন চন্দ্র রায়চৌধুরীর পরিচয়ের সূত্র ধরে তাঁরা মনে করেন, বঙ্কিমচন্দ্রের 'দেবী চৌধুরানী' উপন্যাসের ভবানী পাঠক হলেন মোহনলাল। ইংরেজ কোম্পানির সৈন্যদের সঙ্গে সংঘর্ষে মোহনলাল অর্থাৎ ভবানী পাঠক নিহত হন এবং আহত মজনুশাহ মধুপুর জঙ্গলে প্রাণত্যাগ করেন।[৭৪]

> ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাসের সম্পাদনায় বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ 'দেবী চৌধুরানী' উপন্যাসের যে সংস্করণ প্রকাশ করে তাতে 'ঐতিহাসিক ভূমিকা' লেখেন যদুনাথ সরকার। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে 'দেবী চৌধুরানী' যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই লিখেছেন 'ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা আমার উদ্দেশ্য ছিল না, সুতরাং ঐতিহাসিকতার ভাণ করি নাই। ...দেবী চৌধুরানীরও ঐরূপ [অর্থাৎ 'আনন্দমঠে'র মতো] একটু ঐতিহাসিক মূল্য আছে।... *দেবী চৌধুরানী* গ্রন্থের সঙ্গে ঐতিহাসিক দেবী চৌধুরানীর সম্বন্ধ বড়ো অল্প। দেবী চৌধুরানী, ভবানী পাঠক, গুডল্যাড্ সাহেব, লেফটেনান্ট ব্রেনান্, এই নামগুলি ঐতিহাসিক। ...দেবী চৌধুরানীকে 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' বিবেচনা না করিলে বড়ো বাধিত হইব।[৭৫]

বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা থেকে এই অংশ উদ্ধৃত করে যদুনাথ সরকার লেখেন:

> এ কথা সত্য। নাম ও তারিখ ধরিয়া দেখিতে গেলে, এই উপন্যাসে ইতিহাসকে মানিয়া চলা হয় নাই। প্রকৃত ভবানী পাঠক একজন ভোজপুরী অর্থাৎ আরা জেলার বিহারী ব্রাহ্মণ। তাহার সহযোগী এবং ততোধিক বড়ো ডাকাতের সর্দার মজনুন্‌সাহ, মেওয়াতী অর্থাৎ বর্তমান আলেয়ার রাজ্যের লোক; বাংলায় তাহার জন্ম হয় নাই; এবং মৃত্যুর পর তাহার দেহ বাংলা হইতে সুদূর মেওয়াতে কবর দিবার জন্য পাঠান হয়, বাংলার হেয় জমিতে নহে। তাহাদের অনুচরগণ সব রাজপুত, কেহই বাঙালি নহে—'Not a Bengal (i) rable, but a number of well-armed Réajput.' (১৭৭৬ এবং ১৭৮৭ সনের সরকারী রিপোর্ট)। ভবানী পাঠক

BanglaBook.org

১৭৮৭ সনের জুলাই মাসে ইংরেজ সিপাহিদের সঙ্গে যুদ্ধে মারা যায়, স্ব-ইচ্ছায় ধরা দিয়া দীপান্তরে যাইবার পর নহে (আর, তখন আন্দামানে কয়েদি পাঠানো প্রথা আরম্ভ হয় নাই)। ফলত ওয়ারেন হেস্টিংস পদত্যাগ করিবার কয়েক বৎসর পরে এই সব ডাকাতদের দমন হয় এবং 'দেবী'ও অদৃশ্য হন। দেবী চৌধুরানী নিজ দল ভাঙিবার কয়েক বৎসর আগে কালেক্টর গুড্‌ল্যাড্ সাহেব রঙ্গপুর ছাড়েন।[৭৬]

তারপর যদুনাথ সরকার লেখেন:

কিন্তু যে চিত্রপটের সামনে এই গ্রন্থের ঘটনাবলি অভিনীত হইয়াছে, তাহা অর্থাৎ "দেবী চৌধুরানী'র সামাজিক আবহাওয়া, একেবারে সত্য। খাঁটি বাঙালিরাও ডাকাতি করত। ...আর হেস্টিংস লাট হইবার পর (১৭৭২)-এ দেশের দশা যেরূপ ছিল, বঙ্কিম তাহার অক্ষরে অক্ষরে সত্য বর্ণনা করিয়াছেন। বঙ্কিম মহাপণ্ডিত ছিলেন, বহু বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহার পড়াশুনা ছিল, এবং গভীর চিন্তার সাহায্যে তিনি পঠিত জ্ঞানকে পরিপাক করিয়াছিলেন। মনে রাখিতে হইবে যে, 'দেবী চৌধুরানী'র জন্য কাল ও স্থান, এ দুইটিই বিদ্রোহের সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়া বাছিয়া লওয়া হইয়াছে। ফলে, তখন মুঘল সাম্রাজ্যের দেশব্যাপী শান্তি ও শৃঙ্খলিত শাসন-পদ্ধতি অস্ত গিয়াছে, অথচ ব্রিটিশ শাসন দেশে স্থাপিত হয় নাই—এই দুই মহাযুগের সন্ধি স্থল; রাজনৈতিক গোধূলি অরাজকতার বিশেষ সহায়ক। আর স্থান, সীমান্ত প্রদেশ; 'আনন্দমঠে' বন্য ঝাড়খণ্ডের প্রবেশদ্বার বীরভূম জেলা 'সীতারামে' সমুদ্রের প্রায় ধারে কোণঠেঁষা ভূষণা পরগণা, আর 'দেবী চৌধুরানী'তে রঙ্গপুর জেলা। মুঘল যুগে মোঙ্গোল-জাতীয় কোচ ও আহোম রাজ্য তখন বর্তমানে রঙ্গপুর জেলার উত্তরের ও পূবের অনেকাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল; সীমানা কখন আগাইত, কখন পিছাইত, সুতরাং যুদ্ধ, অন্তত লুঠতরাজ নিত্যনৈমিত্তিক ছিল। সুবা বাংলার কেন্দ্রস্থ জেলাগুলিতে যেমন নিয়মবদ্ধ শাসন ও 'সম্রাটের শান্তি' সজোরে প্রতিষ্ঠিত ছিল, সীমান্ত পরগনাগুলিতে তাহা ছিল না। মহামতি বার্ক একটি সুন্দর উপমা দিয়া দেখাইয়াছেন যে, বিস্তৃত সাম্রাজ্যের হৃৎপিণ্ড হইতে প্রেরিত রক্তের বেগ অতি দূরবর্তী আঙুলের ডগায় পৌঁছিতে পৌঁছিতে অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়ে। বীরভূম, ভূষণা ও রঙ্গপুরেও তাহা হইত।

BanglaBook.org

এই চিরসত্য বঙ্কিমের সৃষ্ট বিদ্রোহের পথ সুগম করিয়া দেয়, তাঁহাকে কষ্টকল্পনার আশ্রয় লইতে হয় নাই।[৭৭]

তারপর যদুনাথ সরকার লেখেন:

আর তখন বাংলা দেশের রাজস্ব বন্দোবস্তের অরাজকতা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। টোডরমলের জমি মাপিয়া প্রজার নিকট হইতে খাজনা নির্ধারণের ব্যবস্থা (জাব্‌তী) বাংলার কোনো অংশে প্রচলিত হইবার সময় পায় নাই; সর্বত্র এই এক জন জমিদারের নিকট থেকে টাকা লইয়া বাংলার সুবাদার, তথা দিল্লির বাদশাহ সন্তুষ্ট থাকিতে বাধ্য হইতেন। তাহাও আবার সব জেলায় নহে। মানসিংহের বঙ্গবিজয়ের পর রাঢ় অঞ্চলে মাত্র নিয়মিতভাবে ও নির্দিষ্ট পরিমাণে রাজস্ব আদায় হইত। রাজশাহি (অর্থাৎ সমস্ত রাজশাহি ও পাবনা এবং বগুড়ার দক্ষিণ অংশ লইয়া প্রকাণ্ড ভূমিখণ্ড) ইসলাম খাঁর সময়ে সম্পূর্ণ বশীভূত হইল, এবং সরকার ঘোড়াঘাট (অর্থাৎ বগুড়া, দিনাজপুর ও রঙ্গপুর, এই তিনটি জেলার সীমানার মিলন-স্থানকে কেন্দ্র করিয়া তাহার ও চারিদিকে একটা বৃত্ত টানিলে ততটা জমি তাহার মধ্যে পড়ে, তাহা,) আরও পরে রীতিমত সরকারি খাজনা দিতে আরম্ভ করিল। ময়মনসিংহ জেলাটা তাহারও একশত বৎসর পরে মুর্শিদকুলি খাঁর প্রবল শাসনে নিয়মিত-রাজস্ব-প্রদায়ী জেলাতে পরিণত হইল, এবং সেটা তাঁহার প্রতিষ্ঠিত নূতন বারেন্দ্র জমিদারদের পরিশ্রমে। এইরূপে রাষ্ট্রীয় শান্তি ও সুশাসন বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সুবাবাংলার মোট রাজস্ব বাড়িতে লাগিল; মুর্শিদকুলি খাঁ প্রথমে আকবরী জমা ছাড়াইয়া উঠেন, আলিবর্দি তাহার উপর রাজকর কয়েক লাখ বাড়াইয়া দেন, এবং সর্বশেষে হতভাগ্য মিরকাসিম ইংরেজদের শোষণের ফলে মোট খাজনার পরিমাণ অসম্ভব রকম বেশি করিয়া তোলেন।[৭৮]

যদুনাথ সরকার লেখেন:

কিন্তু নবাবের শাসনশক্তি যেই পলাসী ও উদয়নালার যুদ্ধের ফলে ভাঙিয়া পড়িল, অথচ যখন ইংরেজরা বণিকত্ব ত্যাগ করিয়া দেশশাসনের দায়িত্ব লইতে ইতস্তত করিতেছিলেন, কোনো রকমে খাজনার টাকা আদায় হইলেই

BanglaBook.org

> তাঁহারা সন্তুষ্ট, ঠিক সেই সময়, সর্বপ্রথমে সীমান্ত জেলাগুলিতে শান্তি চলিয়া গেল, অরাজকতা তন্দ্রা হইতে জাগিল, প্রজা দরিদ্র হইতে লাগিল, খাজনা কোথা হইতে আসিবে? মিরকাসিমের বর্ধিত হারের জমা আদায় করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত হইল। তখন সরকারি তহসিলদারগণ প্রজাদের মারপিট এবং নিজেদের উদর পূরণের জন্য লুঠ আরম্ভ করিয়া দিল।[৭৯]

এই অবস্থা উল্লেখ করার পর যদুনাথ সরকার লেখেন:

> 'দেবী চৌধুরাণী'-তে বর্ণিত যুগে ইংরেজরা জমির অস্থায়ী বন্দোবস্ত করিতেন, নিলামে সর্বোচ্চ দরে এক এক বৎসরের জন্য (পরে একেবারে ৫ বৎসরের জন্য) জমিদারিগুলি ইজারা দেওয়া হইত। ইতিহাস-পাঠক সর্বদেশেই দেখিয়াছেন যে, এই কুপ্রথার ফল ভীষণ প্রজাপীড়ন, চাষের হ্রাস, জমিদারের সর্ব্বনাশ এবং রাজারও নিয়মিত বার্ষিক আয়ে দ্রুত অবনতি। দেশের এই দুর্দশার চিত্র বঙ্কিম ঠিক আঁকিয়াছেন, ইহার কোনো অংশ কল্পিত বা অতিরঞ্জিত নহে। কর্নওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩) আর যাহাই করুক না কেন, অনেক বৎসর ধরিয়া মফস্বলের শান্তি, প্রজার সুখ, এবং রাজস্বের নির্দিষ্টতা আনিয়া দেয়। কিন্তু তাহা যখন ঘটে, তখন 'দেবী চৌধুরানী মরিয়াছে' এবং প্রফুল্ল এক পাল 'বড় ডব্‌ডবে চোখ, গালফুলো' জমিদার-শাবক পালন করিতে ব্যস্ত; ডাকাত রানির বজরা ভাঙিয়া ফেলা হইয়াছে—তখন আর তাহার আবশ্যকতা নাই।[৮০]

যদুনাথ সরকারের ঐতিহাসিক ভূমিকাটি খুবই মূল্যবান। তৎকালীন বাংলার সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা বুঝতে সহায়ক। তিনি সরকারি রিপোর্ট উল্লেখ করে দেখান ১৭৭৬-১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দের সময়কালে ইংরেজ শাসন সর্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি। তিনি যখন এই ভূমিকাটি লেখেন তখন তো ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন নেই। তাই মোহনলাল যদি ভবানী পাঠকই হবেন তাঁর লেখার কী অসুবিধা ছিল? সম্ভবত পলাশির যুদ্ধের পরে মোহনলাল কোথায় ছিলেন এবং ইংরেজ কোম্পানির বিরুদ্ধে কোনো প্রতিরোধ গড়ে তুলে ছিলেন কিনা এই সম্পর্কে সরকারি তথ্যে কোনো কিছু উল্লিখিত না হওয়ায় যদুনাথ সরকার কোনোই খবর পাননি।

BanglaBook.org

সুপ্রকাশ রায় রচিত *ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম* গ্রন্থে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ (১৭৬৩-১৮০০) সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। প্রসঙ্গত তিনি ফকির বিদ্রোহীদের কথাও আলোচনা করেছেন। তিনি লেখেন, এই বিদ্রোহে বিদেশি বণিক শাসনের বিরুদ্ধে 'বাংলা ও বিহারের এক একটি অঞ্চলে দণ্ডায়মান হইলেন মজনুশাহ, মুশা শাহ, চেরাগ আলি, ভবানী পাঠক, দেবী চৌধুরানি, কৃপানাথ, নুরুল মহম্মদ, পীতাম্বর, অনুপ নারায়ণ, শ্রীনিবাস প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ।' সুপ্রকাশ রায় এই বিদ্রোহের প্রকৃতি আলোচনা প্রসঙ্গে লেখেন:

> মোগল শাসনের মধ্যভাগ হইতেই বিহার ও বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে বহু সন্ন্যাসী ও ফকিরের দল স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে আরম্ভ করে। তাহারা কালক্রমে রীতিমত কৃষকে পরিণত হয়। সন্ন্যাসীদের একটি বড়ো দল ময়মনসিংহ ও পূর্ব বাংলার বিভিন্ন জেলায় বসবাস করিতে থাকে। ইহারা প্রধানত 'গিরি' সম্প্রদায় ভুক্ত। ফকিরদের একটি দল বাস করিতে থাকে উত্তরবঙ্গে। ইহারা প্রধানত 'মাদারী' সম্প্রদায়ের ফকির। উত্তরবঙ্গে ইহাদের বহু দরগা ও তীর্থক্ষেত্র থাকায় ইহারা প্রধানত উত্তরবঙ্গেই ভিড় করে। এই সকল সন্ন্যাসী ও ফকির চাষবাসের মারফত রীতিমত কৃষকে পরিণত হয় এবং ইংরেজ শাসনের প্রথম হইতেই কৃষক হিসাবে ইহারাও ইংরেজ বণিক রাজের শোষণের শিকার হইয়া উঠে।[৮১]

সুপ্রকাশ রায় ভবানী পাঠককে 'বাংলার বিখ্যাত বিদ্রোহী নায়ক' বলে উল্লেখ করলেও তিনি যে মোহনলাল ছিলেন তা কোথাও উল্লেখ করেননি।[৮২] তিনি লেখেন:

> ইংরেজ সৈন্যদের সঙ্গে সংঘর্ষে মজনু আহত হন এবং ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষ দিকে মাখনপুরে 'সন্ন্যাসী' বিদ্রোহের শ্রেষ্ঠতম নায়কের কর্মময় জীবনের অবসান ঘটে।[৮৩]

তিনি লেখেন:

> ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দের জুন মাস হইতে বাংলার বিখ্যাত বিদ্রোহী নায়ক ভবানী পাঠক ও বিদ্রোহী নায়িকা দেবী চৌধুরাণীর উল্লেখ দেখা যায়।[৮৪]

BanglaBook.org

পরে ইংরেজ সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধে ভবানী পাঠক নিহত হন। তারপর:

> ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত বিদ্রোহীদের কোনো উল্লেখ দেখা যায় না।[৮৫]

বাংলাদেশে প্রকাশিত Banglapedia-তে ফকির ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যায়। ইংরেজ কোম্পানির বিরুদ্ধে তাদের বিদ্রোহ উল্লেখ করে লেখা হয়:

> The resistance movement got ready support from the peasantry who were hard pressed under the new Land revenue policy of the company government.[৮৬]

ফকির ও সন্ন্যাসীদের বিষয়ে লেখা হয়:

> The resisting fakirs belonged to the *Madaria tarika*, a sufi sect which flourished in Bengal under the leadership of Shah Sultan Hasan Suriya Burrhana in the second half of the seventeenth century. The Sannasis were the Vedantic Hindu Jogis belonging to the Giri and Puri groups of *ek-dandi* sannasism. Both fakirs and sannyasis were armed bands living in *Khankahs* and *akhdas*.[৮৭]

এই গ্রন্থে লেখা হয়, এই বিদ্রোহের অন্যতম নেতা মজনুশাহ মাদারিয়া গোষ্ঠীর একজন সুফি সাধক ছিলেন। তাঁর অনুগামী ছিলেন মুসা শাহ, চিরাগ আলি শাহ, পরাগলা শাহ, সোভান শাহ ও করিম শাহর মতো সুফিরা। ভোজপুরী ব্রাহ্মণ ভবানী পাঠক মজনু শাহর সঙ্গে আলোচনা করেন এবং ছোটো জমিদার দেবী চৌধুরাণীর সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ পরিচালনা করেন। এই বিদ্রোহের বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে লেখা হয়, মজনু শাহ ইংরেজ সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধে কালেশ্বর-এ আহত হন এবং ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দের শেষে অথবা ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দের প্রথমে মারা যান। মজনু শাহ আহত হবার আগে তাঁর অনুগামীদের নিয়ে মধুপুর জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। এই গ্রন্থে ভবানী পাঠক সম্পর্কে বিস্তৃত কোনো

BanglaBook.org

আলোচনা করা হয়নি। ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ এই বিদ্রোহীরা দমিত হয় এবং বাংলায় সমস্ত জায়গায় ব্রিটিশ আধিপত্য স্থাপিত হয়।[৮৮]

যাঁরা সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ সম্পর্কে লিখেছেন তাঁরা সবাই প্রধানত সরকারি তথ্যের ওপর নির্ভর করে এই বিদ্রোহের বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। তাঁরা পলাশি যুদ্ধে বিপর্যয়ের পরে মোহনলালের গতিবিধি সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোনো তথ্য না পেয়ে স্বাভাবিকভাবেই তাঁকে ভবানী পাঠক বলে চিহ্নিত করেননি। লালা দে পরিবারের মতের সঙ্গে তাঁদের মতের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।[৮৯] তার জন্য অবশ্য লালা দে পরিবারের তথ্য অগ্রাহ্য করার কারণ নেই। আঠারো শতকের পারিববারিক জীবনের তথ্যসমূহ এই শতকের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস আলোচনায় অপরিহার্য। আমরা তো এই দাবি করতে পারি না যে, আঠারো শতকের বাংলার পারিবারিক জীবনের সব তথ্যসমূহ সংগৃহীত হয়েছে। সেই দিক থেকে লালা দে পরিবার কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যের গুরুত্ব ভাবা উচিত।

যাদব সম্প্রদায়ের সংগৃহীত তথ্য থেকে জানা যায়, মোহনলাল পলাতক অবস্থায় নদিয়া, বর্ধমান ও হুগলি জেলার বিভিন্ন স্থানে ছিলেন। এই সব স্থানের প্রাচীন মন্দিরে তিনি সন্ন্যাসীর বেশে থাকতেন। নদিয়া জেলার জুড়ানপুরের কালীপীঠে তিনি ছিলেন। কালীপীঠ ছিল প্রাচীন বাংলার শক্তিসাধনার কেন্দ্র। মোহনলাল নিজেও শাক্ত ছিলেন। জুড়ানপুরের সতীপীঠের গর্ভগৃহের নিরাপদ আশ্রয়ে থেকে মোহনলাল শতাধিক গ্রামের যুবকদের যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী করেন।[৯০] ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময়ে তাদের নিয়ে তিনি ইংরেজ কোম্পানির রাজস্ব লুণ্ঠন করে দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের মধ্যে বণ্টন করে ওই এলাকার সাধারণ মানুষকে রক্ষা করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু ইংরেজ প্রশাসকরা তাঁদের বজরা লুঠের কোনো হদিস পাননি। তার ফলে বাংলায় কোম্পানির শাসন সুদৃঢ় হবার পর ওই এলাকাকে 'সন্ত্রাস কবলিত এলাকা' বলে চিহ্নিত করা হয়। এই কারণে ওই অঞ্চলের বাসিন্দা পল্লব, গোপ, যাদবদের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত দুর্ভোগ ভুগতে হয়েছিল।[৯১]

আর একটি কাহিনিও প্রচারিত হয় যে, মোহনলাল তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলি হুগলি জেলার গুপ্তিপাড়ার শ্রীশ্রী বৃন্দাবন চন্দ্র জীউ মঠে কাটান। এই মঠের সামনে একটি স্তম্ভ পলাশি যুদ্ধের বীর মোহনলালের স্মৃতিকে আজও বহন করছে। গুপ্তিপাড়ার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এমন কথাও বলেন:

BanglaBook.org

> মোহনলালের জন্মস্থান হল গুপ্তিপাড়া। জুড়ানপুরের কালীপীঠ থেকে এখানে এসে তিনি একজন সাধারণ সন্ন্যাসী হিসেবে থাকেন এবং এই মঠেই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ছিলেন।[৯২]

আমি পূর্বেই বলেছি, স্যার যদুনাথ সরকার সম্পাদিত *History of Bengal*, Vol II, গ্রন্থের Index অংশে তাঁকে 'মোহনলাল কাশ্মিরী' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যদিকে যাদব সম্প্রদায়ের যেসব তথ্য আমি পেয়েছি তাতে পূর্ণিয়া অঞ্চলের যাদবদের একটি অংশ নিজেদের মোহনলালের বংশধর বলে দাবি করেন।[৯৩]

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯) মুর্শিদাবাদ জেলার জেমো কান্দি অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। নিখিলনাথ রায় লেখেন:

> রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী কাহার নিকট শুনিয়াছিলেন যে, মোহনলাল বংশীয়রা অদ্যাপি বর্ধমানে বাস করিতেছেন। পরন্তু এ বিষয়ে অনুসন্ধান না হইলে কিছুই স্থির করা যায় না। *রিয়াজুস সালাতীন* নামক গ্রন্থে মোহনলালকে কায়স্থ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। তাহা হইতে তিনি বাঙালি ছিলেন কিনা বুঝা যায় না।[৯৪]

নিখিলনাথ রায় আরও লেখেন:

> মুর্শিদাবাদের নবাবদিগের সময়ে যে-সমস্ত বাঙালি উচ্চ পদাভিষিক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের বাসস্থানের ও তদ্বংশীয় গণের আজও পরিচয় পাওয়া যায়; কিন্তু মোহনলাল সম্বন্ধে পাওয়া যায় না।[৯৫]

নিখিলনাথ রায় এই কথাও লেখেন:

> কেহ কেহ মোহনলালকে বাঙালি কায়স্থ নির্দেশ বলিয়া থাকেন, কিন্তু তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না।[৯৬]

মুর্শিদাবাদ কাহিনী গ্রন্থের পরিশিষ্ট অংশ থেকে জানা যায়, আঠারো শতকে পলাশির যুদ্ধকে কেন্দ্র করে কিছু কবিতা ও সংগীত রচিত হয়েছিল। 'মিরমদনের

BanglaBook.org

বীরত্ব কাহিনি ও পলাশি যুদ্ধের কথা পলাশি অঞ্চলে' গ্রাম্য কবিতায় গীত হত বলে সংবাদ পাওয়া যায়। কিন্তু তা সংগৃহীত ও সংরক্ষিত না হওয়ায় সেকালের গ্রামীণ মানুষের মনোভাব সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব নয়। এই গ্রন্থে 'পলাশী যুদ্ধের গ্রাম্য গীত' শিরোনামে একটি সংগীত সংযোজিত হয়েছে। টীকা অংশে লেখক নিখিলনাথ রায় এই সংগীতের বিষয়বস্তু সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করেছেন। এই সংগীতে লুৎফউন্নেসাকে 'মোহনলালের বেটী' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সাধারণ লোক 'ভগিনীকে বেটি' বলে উল্লেখ করত। মোহনলালের ভগিনী সম্পর্কে এই ভুল ধারণা শিক্ষিত ও অশিক্ষিত অনেকের মধ্যেই ছিল। নিখিলনাথ রায় সে কথাই উল্লেখ করেছেন।[৯৭]

সুতরাং মোহনলালের পলাতক জীবনের শেষ দিনগুলি সম্বন্ধে নানা কাহিনি পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন আঠারো শতকের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত এক উজ্জ্বল ব্যক্তি। বাংলা, বিহার ও ওড়িশার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্‌দৌলা যে কয়জন উচ্চপদস্থ হিন্দু অফিসারদের ওপর নির্ভর করতেন তাঁদের মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন। তাছাড়া তিনি নবাবের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ও ছিলেন। পলাশির যুদ্ধে মিরমদন নিহত হওয়ার পর মোহনলাল যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার পক্ষপাতী হলেও মিরজাফরের ষড়যন্ত্রে তা ব্যর্থ হয়। মোহনলালের প্রভাব নবাবের প্রশাসনে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মধ্যে ঈর্ষা ও ক্ষোভের সৃষ্টি করে। তাই তাঁকে ও তাঁর বোনকে কালঙ্কিত করার প্রয়াসও লক্ষ করা যায়। উল্লেখ্য, সিরাজউদ্‌দৌলার চরিত্রকে কলঙ্কিত করার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ প্রশাসকরা যে 'হলওয়েল মনুমেন্ট' কলকাতায় নির্মাণ করেন তাতো একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।[৯৮] আঠারো শতকের মোহনলাল ও বিশ শতকের প্রথম পাদের জাতীয় নেতা সুভাষচন্দ্র বসুর সময়কালের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামী রূপেই তাঁরা গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তাই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী প্রশাসকরা তাঁদের দুজনকে ক্ষমা করতে পারেননি। দুজনেই তাঁদের জীবনের শেষ দিকে ইতিহাসের পাতা থেকে হারিয়ে গেলেন। ঔপনিবেশিক আমলে মোহনলালকে খুঁজে পাওয়া কষ্টকর ছিল। কিন্তু স্বাধীন ভারতে সুভাষচন্দ্রের মতো একজন জাতীয় নেতার কোনই খোঁজ পাওয়া যাবে না, এতো কল্পনা করা যায় না। এর চেয়ে বড়ো বেদনার কারণ আর কী হতে পারে?

BanglaBook.org

সূ ত্রা ব লি

১ Sir Jadunath Sarkar (Edited), *The History of Bengal*, Vol II, Muslim Period 1200–1757, Published by the University of Dacca, Second Impression, July, 1972 (First Edition, August 1948), দ্রষ্টব্য Bibliography (PP 501–508)

২ Ibid, pp 490–491

৩ Ibid, p 491.

৪ Ibid

৫ Ibid

৬ Ibid, p 492. দ্রষ্টব্য foot note.

৭ Ibid, p 493.

৮ Ibid, স্যার যদুনাথ সরকার লেখেন, 'Among the wounded officers were Mohan Lal, Manik Chand (a Bengali Kayastha) and Khwaja Hadi.' (Ibid).

৯ *The History of Bengal*, Vol II, P 470; সুশীল চৌধুরী, পলাশির অজানা কাহিনী, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০০৫, পৃষ্ঠা: ১১১-১১৪ (প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৪) সিরাজউদ্‌দৌলা ও মিরজাফর সম্পর্ক নিয়ে অধ্যাপক চৌধুরীর আলোচনায় মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়।

১০ The History of Bengal, Vol II, pp 493, 522.

১১ Ibid, দ্রষ্টব্য Table of Contents, XIII. স্বভাবতই দুরকমের তথ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে। Professor Nirod Bhusan Roy এই গ্রন্থের index তৈরি করেন।

BanglaBook.org

অধ্যাপক রজতকান্ত রায় তাঁর গ্রন্থে টীকা অংশে মোহন লালের নিহত হওয়ার খবর উল্লেখ করেন। আবার আর একটি জায়গায় লেখেন: 'খাজা আবদুল হাদি খান, মানিকচন্দ ও মোহনলাল নিজে জখম হলেন' (দ্রষ্টব্য রজতকান্ত রায়, পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ আগস্ট ২০১১ (প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৪), পৃষ্ঠা ১৪, ২৪৫, ২৫২, রজতকান্ত রায় সুনির্দিষ্ট করে না বলায় দ্বিধাগ্রস্ত হতে হয়।

১২ Sonia Amin, *The Tombs of Murshidabad*, Published in The Daily Star Bangladesh, Saturday, March 8, 2008. Sonia Amin, a Professor of History, Dhaka University, Bangladesh, visited the historical places of Murshidabad along with Dr. Keka Datta Ray and wrote this paper.

১৩ রজত কান্ত রায়, পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ, পৃষ্ঠা ১৪

১৪ তদেব, পৃষ্ঠা ১১

১৫ তদেব, পৃষ্ঠা ১৩

১৬ Sir Jadunath Sarkar (Edited), *The History of Bengal*, Vol. II.

১৭ নিখিলনাথ রায়, মুর্শিদাবাদ কাহিনী, কলকাতা নভেম্বর, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা ১১৭

১৮ তদেব, পৃষ্ঠা ১১৭-১১৯

১৯ Lala Ajay kumar Dey, *The Legacy goes on–Untold Truth* and Ajay Ray Chaudhary, S/O Late Wing Commandar Lala Chitswarupa Dey, IAF (Retd.), Lala Bijon Dey Sawian, IPS (Retd.) and Lala Shyamal Dey, S/O Late Major Lala Nawal Kumar Dey, IAS (Retd.), Heara's Legacy, in Unpublished Papers of Lala Dey Family. এই দুটো মূল্যবান অপ্রকাশিত প্রবন্ধ থেকে আমি অনেক তথ্য পেয়েছি। অজয় কুমার দে ও অজয় রায়চৌধুরী একই ব্যক্তি।

২০ Ibid

২১ Sonia Amin, op. cit.

২২ নিখিলনাথ রায়, *মুর্শিদাবাদ কাহিনী*, পৃষ্ঠা ১১৮-১১৯

২৩ Lala Ajoy Kumar Dey and Ajay Roy Chaudhary, Lala Bijon Dey and Lala Shyamal Dey's, Heera's Legacy op. cit.

২৪ Ibid; শৌরীন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী, রাঁকাই নগরের ইতিবৃত্ত, দ্রষ্টব্য জাহ্নবী, মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী, শ্রী গিরীন্দ্র মোহিনী দাসী সম্পাদিত, কলিকাতা, পৌষ ১৩১৫, পৃষ্ঠা ৩৫৩-৩৫৬। এই প্রবন্ধটি বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত

BanglaBook.org

আছে। এই গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষ অনুগ্রহ করে আমার ব্যবহারের জন্য এক কপি Xerox করে পাঠিয়েছেন। তার ফলে আমি এই অঞ্চল সম্পর্কে জানতে পারি। গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এই প্রবন্ধ থেকেই আমি সর্বপ্রথম জানতে পারি রেনেল তাঁর মানচিত্রে এই স্থানের নাম উল্লেখ করেছেন। এই স্থানেই মোহনলাল সিরাজপুত্রকে নিয়ে প্রথম আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন।

২৫ কেদারনাথ মজুমদার, হরচন্দ্র চৌধুরী, শৌরীন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী, সংগ্রহ ও গ্রন্থনা কমল চৌধুরী, ময়মনসিংহের ইতিহাস, কলকাতা, প্রথম দে'জ সংস্করণ, জানুয়ারি, ২০০৫, মাঘ ১৪১১, পৃষ্ঠা ৪৭০-৪৭১ এই গ্রন্থে লিখিত আছে; 'শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরী ১৭৫৭ কি ১৭৫৮ খ্রি- ইহলোক ত্যাগ করেন তাহার ঠিক নাই, মোটের উপর এই দুই সনের এক সনে তাহার দেহত্যাগ হয় ইহা অবধারিত' (পৃষ্ঠা ৪৫৭)। দ্রষ্টব্য Lala Ajay Kumar Dey and Ajoy Roy Chaudhary, Lala Bijon Dey and Lala Shyamal Dey, op. cit.

২৬ *ময়মনসিংহের ইতিহাস*, পৃষ্ঠা ৪৭০-৪৭১

২৭ তদেব, পৃষ্ঠা ৪৭৩-৪৭৪

২৮ তদেব, পৃষ্ঠা ৪৭৩

২৯ তদেব, পৃষ্ঠা ৪৯২

৩০ তদেব, পৃষ্ঠা ৪৯২-৯৩

৩১ তদেব, পৃষ্ঠা ৪৯৩

৩২ তদেব, পৃষ্ঠা ৪৯৪

৩৩ তদেব, পৃষ্ঠা ৪৯৫-৪৯৭

৩৪ তদেব, পৃষ্ঠা ৪৯৭-৪৯৮

৩৫ তদেব

৩৬ তদেব, পৃষ্ঠা ৪৯৯

৩৭ তদেব, পৃষ্ঠা ৪৭৪

৩৮ তদেব, পৃষ্ঠা ৪৭৫

৩৯ তদেব, পৃষ্ঠা ৪৭৮

৪০ তদেব, পৃষ্ঠা ৪৭৯

৪১ তদেব, পৃষ্ঠা ৪৭৯-৪৮২

BanglaBook.org

৪২ তদেব, পৃষ্ঠা ৪৯৯; হেমন্ত বালা দেবী রচিত, *পুরানো দিনের কথা*, রচনা সংকলন, সম্পাদক যশোধরা বাগচী ও অভিজিৎ সেন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, নভেম্বর ১৯৯২, এই গ্রন্থে যুগলকিশোর সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। শ্রীমতী জয়ন্তী সান্যালের দিদিমা ছিলেন গৌরীপুর জমিদার বাড়ির হেমন্তবালা দেবী। জয়ন্তী সান্যালও যুগলকিশোর সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছেন। জয়ন্তী সান্যাল সে কথা আমাকে বলেন। তিনি এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন।

৪৩ *ময়নসিংহের ইতিহাস*, পৃষ্ঠা ৫০১

৪৪ তদেব, পৃষ্ঠা ৫০০

৪৫ তদেব, পৃষ্ঠা, ৫০১-৫০২

৪৬ তদেব, পৃষ্ঠা ৫০৩

৪৭ তদেব,

৪৮ Lala Ajay Kumar Dey, *The Legacy goes on–untold Truth*, op. cit.

যুগল কিশোরের পুত্র প্রাণকৃষ্ণ নাথের প্রথম পুত্র কাজল ১২ বছরের মারা যান। তাঁর দ্বিতীয় ছেলের নাম ছিল শৌরীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী। পরে তাঁর নাম পরিবর্তন করে হয় প্রসন্ন চন্দ্র রায় চৌধুরী। প্রসন্নচন্দ্র রায়চৌধুরী কলকাতার হিন্দু কলেজে পড়াশুনা করেন এবং ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে আর্টস নিয়ে গ্রাজুয়েট হন। লালা অজয় কুমার দে লেখেন, ছাত্রাবস্থায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল। পরে আবার প্রসন্ন চন্দ্র রায়চৌধুরী নাম পরিবর্তন করে হন প্রসন্নকুমার দে।

৪৯ *ময়মনসিংহের ইতিহাস*, পৃষ্ঠা ৫০০

৫০ Lala Ajay Kumar Dey, op. cit; *Heera's Legacy*, op. cit.

৫১ *Heera's Legacy*, op. cit.

৫২ Ibid.

৫৩ Presidency College Ragister, Compiled and Edited by Surendra Chandra Majumdar and Gokul Nath Dhar, Published by Goverment of Bengal, Calcutta, পরিশিষ্ট ৩ দ্রষ্টব্য।

৫৪ Prasanna Kumar Dey, *Indian Bouquet*, in Mapping the Nation (Book of poets of Undivided Bengal), Published by Anthem Press, U.S.A., 2012. প্রসন্ন কুমার দে-রচিত এই কবিতা গ্রন্থ ১৯০৬

BanglaBook.org

সালে সামান্য কয়েক কপি কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। এক কপি ব্রিটিশ লাইব্রেরি, লন্ডন-এ সংরক্ষিত আছে। লন্ডন থেকে এই গ্রন্থের কপি আমেরিকার ওয়াশিংটন লাইব্রেরিতে সংগৃহীত হয়েছে। Irene Joshi, university of Maryland, U.S.A. প্রথমে এই গ্রন্থের কবিতাগুলি সংকলিত করেন।

ারতীয় কবিরা ইংরেজিতে ১৮৭০-১৯২০ খ্রিস্টাব্দে যেসব কবিতা রচনা করেছেন তা থেকে কবিদের কয়েকটি করে কবিতা নিয়ে *Mapping The Nation* কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অরবিন্দ ঘোষ, সরোজিনী নাইডু, প্রসন্নকুমার দে প্রমুখ অনেকের কবিতা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রসন্ন কুমার দের দুটি কবিতা তাতে রয়েছে Swami Vivekananda at Chicago এবং The Boers. দ্র. Mappning The Nation, An Ahthology of Indian Poetry in Enlish, 1870-1929, Edited by Sheshalatha Reddy, Imprint : Anthem Press, U.S.A., May 2012.

৫৫ শৌরীন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী রচিত *জাহ্নবী* ও *ভারতী* পত্রিকায় প্রকাশিত দুটি প্রবন্ধে পরিশিষ্ট ১ এবং ২ দ্রষ্টব্য।

৫৬ *Heera's Legacy*, op. cit.

৫৭ Ibid

৫৮ Ibid

৫৯ *ময়মনসিংহের ইতিহাস*, পৃষ্ঠা ৪৯৯

৬০ *Mapping the Nation*, op. cit.

৬১ *Heera's Legacy*, op. cit.

৬২ Ibid

৬৩ Lala Ajay Kumar Dey, op. cit.; Lala Bijon Kumar Dey, *My Recollection of Family Tales*. বিজন দে লেখেন, বিজয় কুমার দে গুয়াহাটি হাইকোর্টেও প্রাকটিস করতেন। তিনি আরও লেখেন, বিজয় কুমার দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও আইন পড়েছিলেন। তিনি চমৎকার ইংরেজি বলতেন। বিজয় কুমার দে জনসংঘ পার্টির সমর্থক ছিলেন। এমনকি অবিভক্ত অসম রাজ্যের শিলং বিধানসভার নির্বাচন কেন্দ্রে জনসংঘের প্রার্থী হিসেবে দাঁড়ান। (দ্র. Bijon Kumar Dey op. cit.)

৬৪ Ibid.

লালা বিজয় কুমার দে-র প্রথম পুত্র লালা বিমলেন্দু কুমার দে, IPS (Retd.), Inspector General of Police Assam, তিনি ছিলেন Last Inspector

BanglaBook.org

General of Police undivided Assam, দ্বিতীয়পুত্র লালা চিৎস্বরূপানন্দ দে, Wing Commander, Indian Air Force (Retd.), তৃতীয় পুত্র লালা কল্যাণ কুমার দে, মার্কিন দেশের বাসিন্দা এবং চতুর্থ পুত্র লালা তুলসী দে। বিজয় কুমারের প্রথম কন্যা বীনা সেনের স্বামী হলেন অমর সেন, Colonel Indian Army (Retd.), দ্বিতীয় কন্যা মিরা ঘোষের স্বামী হলেন জে. এন. ঘোষ, Lt. Colonel Indian Army (Retd.) এবং তৃতীয় কন্যা গৌরী। লালা চিৎস্বরূপানন্দ দে বিহারের গিরিডির হরেন্দ্রনাথ সিংহের কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁদের সন্তান লালা অজয় কুমার দে ঠাকুর্দার সঙ্গে শিলং থাকতেন। Lala Bimalendu Kumar Dey was married to Ka Lisimon Sawian, the second daughter of Ka Hinimon and Elimanik Syiem, Scion of the princely State of Mylliem on 15 March, 1949. (দ্র. Bijon Kumar Dey, op. cit.)

লালা বিজয় কুমার দে তাঁর সর্ব কনিষ্ঠ ভাই নওয়াল কুমার কে নিজের কাছে নিয়ে আসেন। লালা নওয়াল কুমার দে Assam Regiment of the Indian Army তে কাজ করতেন। এই সব তথ্য লালা দে পরিবার থেকে আমি সংগ্রহ করেছি।

৬৫ Lala Bishnu Dey, About Sons of Lala Prasanna Kumar Dey from his Third Marriage, in the Papers of Lala Dey Family.

৬৬ Ibid.

৬৭ Ibid.

৬৮ Ibid.; R.C. Majumdar, *History of the Freedom Movement in India*, Vol. III, Calcutta, 1963, pp. 804-805, 814: R.C. Majumdar লেখেন: 'In Sylhet a majority of the voters—239, 619 to 184, 041—were in favour of separation and joining East Bengal.'

৬৯ Lala Bishnu Dey, op, cit.

৭০ Lala Ajay Kumar Dey, The Legacy Goes on-untold–Truth, op. cit; চঞ্চল কুমার শর্মা, শ্রীহট্টে বিপ্লববাদ ও কমিউনিস্ট আন্দোলন, কলকাতা, ১৯৮৪; স্মৃতিময় দিনগুলো, ঢাকা, জুন ২০০৭, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন, ঢাকা

৭১ *Heera's Legacy*, op. cit.; Lala Bijon Kumar Dey, op. cit., লালা বিজন কুমার দে লিখিত অনুস্মৃতিমূলক প্রবন্ধে বিজয় কুমার দে সম্পর্কে যেসব তথ্য পাওয়া যায়, তাতে জানা যায় বিজয় কুমার দের স্ত্রীর নাম ছিল সুলতা।

BanglaBook.org

তিনি ছিলেন জমিদার এবং সিলেটের কাসটো ঘর-এর বিখ্যাত ব্যবহারজীবী জয়নারায়ণ দেব চৌধুরীর বড় মেয়ে। মধ্য শিলং-এর লাবন ও জেল রোডে বাঙালিরা বাস করলেও বিজয় কুমার দে স্থানীয় খাসি অধিবাসীদের মধ্যে বাস করতেন। সেই অঞ্চলের নাম ছিল Jaiaw, এখানে তিনি একটি চিনা পরিবারের বাড়ি কিনেছিলেন। তাঁর বাড়িটি ছিল বিভিন্ন মানুষের বৌদ্ধিক আলোচনার কেন্দ্র। বিজয় কুমার দে ধুতি, কুর্তা, শার্ট ছাড়াও চিনা কোট, প্যান্ট অথবা শেরওয়ানি ও চুড়িদার পাজামা পরতেন। (দ্র Lala Bijon Kumar Dey, op. cit.)

লালা বিজন কুমার দে মেঘালয়ের Director General of Police ছিলেন। তিনি ছিলেন প্রথম IPS Officer যিনি The Secretary Security in the Govt. of India পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি একজন দক্ষ অশ্বারোহী ছিলেন। বিজন কুমারের বড় ছেলে Atiar Lincon's Inn থেকে পাশ করা একজন ব্যারিস্টার। ছোটো ছেলে Hanut ব্যবসায়ী। (See note by Lala Ajay Kumar Dey).

৭২ Ibid, পরিশিষ্ঠ ৪. দ্রষ্টব্য-লালা বিজয় কুমার দের বংশতালিকা।

৭৩ ডা. স্বপন কুমার ঘোষ, মহারাজা মোহন লালের স্মৃতি বিজরিত স্থান ও তাঁর বংশধরেরা, প্রকাশিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। যাদব সম্প্রদায়ে সংরক্ষিত কাগজপত্র। ডা. স্বপন কুমার ঘোষ বঙ্গীয় যাদব মহাসভার সভাপতি। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে এইসব তথ্য আমার পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। ডা. স্বপ্ন কুমার ঘোষ তাঁর প্রবন্ধে লেখেন, মোহনলালের বড়ো ছেলে রাজা শ্রীমন্ত লাল ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে পূর্ণিয়ার নায়েব নাজিমের দায়িত্বে ছিলেন। মিরনের আদেশে তাঁকে বন্দি করে হত্যা করা হয়। শ্রীমন্ত লালের একমাত্র পুত্র বালক হনুমন্তলাল সে সময়ে ভাগলপুরে মাতুলালয়ে থাকায় বেঁচে যান। মোহনলালের বংশধরদের হত্যা করা হবে, এই সংবাদ পেয়ে হনুমন্তলালকে উত্তর প্রদেশের বালিয়ার সুরক্ষিত স্থানে প্রেরণ করা হয়।

ডা. ঘোষ আরও লেখন, সম্ভবত মিরজাফরের আমলেই পূর্ণিয়াকে বিহারের অন্তর্গত করা হয় এবং পূর্ণিয়ার জন্য পৃথক নায়েব নাজিম পদের অবলুপ্তি ঘটানো হয়। পূর্ণিয়ার নায়েব নাজিমের জন্য নির্দিষ্ট নবাব বাড়ির শেষ বাসিন্দা সম্ভবত মহারাজা মোহনলাল এবং তাঁর পুত্র রাজা শ্রীমন্তলাল। সেই নবাব বাড়ির ধ্বংসাবশেষ আজও বিদ্যমান। বর্তমান পূর্ণিয়া শহরের পুরোনো এলাকা চিমনী বাজার সংলগ্ন এলাকায় ফাঁকা মাঠের মধ্যে ছোটো ছোটো লতাগুল্ম ও বাঁশঝাড়ের আড়ালে ভাঙ্গা চোড়া ইটের স্তূপ নবাব বাড়ির পুরোনো স্মৃতিকে বহন করে চলেছে।

BanglaBook.org

উল্লেখ্য, মোহনলালের পুত্র হুক্কালাল ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় জুড়ানপুরে ছিলেন। এই সময়ে মহামারির প্রকোপে জুড়ানপুর ও তার সন্নিহিত এলাকাতে বহু গ্রাম জনশূন্য হয়ে যায়। সেই সময়ে হুক্কালাল মারা যান। তখন তাঁর পুত্র দুঃখীচাঁদ লালের বয়স ৯-১০ বছর। পিতৃহারা দুঃখী চাঁদ মামার বাড়িতেই মানুষ হন এবং জুড়ানপুর গ্রামেই স্থায়ীভাবে বাস করেন।' তাঁর পুত্র মদনলাল তার নামের সাথে মামাদের পদবী 'ঘোষ' যোগ করে হয়ে যান মদনলাল ঘোষ। এই ভাবে মোহনলালের বংশের ধারা অব্যাহত থাকে। পূর্ণিয়ার যাদবদের লালবংশ নিজেদের মোহনলালের বংশধর বলেই দাবি করেন। এই বংশধরদের উদ্যোগেই পরবর্তীকালে বিহার গোপ জাতীয় মহাসভার এবং সর্বভারতীয় যাদব মহাসভার উদ্ভব হয়। (দ্র ডা. স্বপন কুমার ঘোষ লিখিত প্রবন্ধ)

৭৪ Lala Ajay Kumar Dey, op. cit.

৭৫ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *দেবী চৌধুরাণী*, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ শ্রাবণ ১৪১৫, দ্রষ্টব্য যদুনাথ সরকার, ঐতিহাসিক ভূমিকা

৭৬ তদেব

৭৭ তদেব

৭৮ তদেব

৭৯ তদেব

৮০ তদেব

৮১ সুপ্রকাশ রায়, *ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম*, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ জুলাই ১৯৬৬, পৃষ্ঠা ২০-৫৩

৮২ তদেব

৮৩ তদেব, পৃষ্ঠা ৪৫

৮৪ তদেব, পৃষ্ঠা ৪৬

৮৫ তদেব, পৃষ্ঠা ৪৭

৮৬ *Banglapedia*

৮৭ Ibid

৮৮ Ibid

৮৯ Ibid

BanglaBook.org

৯০ ডা. স্বপন কুমার ঘোষ, *মহারাজ মোহনলালের স্মৃতি বিজরিত স্থান ও তাঁর বংশধরেরা* (প্রকাশিত প্রবন্ধ)।

৯১ তদেব

৯২ তদেব

৯৩ তদেব

৯৪ নিখিল নাথ রায়, *মুর্শিদাবাদ কাহিনী*, পৃষ্ঠা ১১৫

৯৫ তদেব, পৃষ্ঠা ১১৪-১১৫

৯৬ তদেব, পৃষ্ঠা ১১৪

৯৭ তদেব, মুর্শিদাবাদ কাহিনীর পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

৯৮ কালিপদ বিশ্বাস, *যুক্ত বাংলার শেষ অধ্যায়*, কলিকাতা আগস্ট, ১৯৬৬, পৃষ্ঠা ৩৩, বিখ্যাত সাংবাদিক কালিপদ বিশ্বাস হলওয়েল মনুমেন্ট আন্দোলন প্রত্যক্ষ করে লেখেন:

> হলওয়েল মনুমেন্ট নিয়ে যখন সুভাষ বসু বাঙালি হিন্দু-মুসলমানদের সহযোগে আন্দোলন শুরু করলেন ফজলুল হক সে প্রতিবাদের ভবিষ্যৎ ইঙ্গিত ধরতে পেরেই সে মনুমেন্ট ডালহৌসি স্কোয়ার থেকে দূরীভূত করবার সিদ্ধান্ত করেন।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

পরিশিষ্ট

১. বোকাইনগরের ইতিবৃত্ত

রেনেল কৃত বাংলা-দেশের প্রাচীন মানচিত্রে, ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্বতটে ময়মনসিংহ জেলায় বোকাইনগর নামে একটা গ্রামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রামটি বর্তমান ময়মনসিংহ-জমিদারির অন্তর্গত নহে, কালেক্টরির খারিজা তালুক, স্থানীয় জনকয়েক মুসলমান তালুকদার এই তালুকের অধিকারী। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ১ ক্রোশ ও প্রস্থ প্রায় অর্ধ ক্রোশ হইবে। গ্রামের অভ্যন্তরে নিরানব্বইটি কূপ এবং ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ১৫টি পুষ্করিণী আছে। অধিবাসীর সংখ্যা অতি অল্প, কয়েক ঘর দরিদ্র মুসলমান ছাড়া অন্য লোক নাই। দশ বৎসর পূর্বে এ স্থান ভীষণ হিংস্রজন্তুপূর্ণ নিবিড় অরণ্যে আবৃত ছিল, তখন দিবালোকেও লোকে চলাচল করিতে ভয় পাইত। বর্তমানে আবার ইহার অবস্থা পরিবর্তিত হইতেছে। অধিবাসীগণ সমস্ত জঙ্গল কাটাইয়া স্থানটিকে চাষবাসের উপযোগী করিয়া তুলিতেছে; গ্রামের মধ্যস্থলে একটি প্রাচীন দুর্গের কঙ্কাল-চিহ্ন অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। কোন্ সময়ে ইহা প্রথমে নির্মিত হয়, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। তবে জনপ্রবাদ হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে বঙ্গদেশে বারো ভুঁইয়ার বিদ্রোহানল প্রবল হইয়া উঠিলে দিল্লিশ্বর জাহাঙ্গির খাজে ওস্‌মান নামক জনৈক সেনাপতির অধীনে একদল মোগলসৈন্য প্রেরণ করেন; বোধ হয় এই খাজে ওস্‌মান কর্তৃকই বর্তমান কেল্লার ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। রাজস্ব-নিরূপণ ভূমির বন্দোবস্তের জন্য একটি কাননগুর কার্যালয়ও এই সঙ্গে স্থাপিত হয়।

মোগল অধিকারের পূর্বে এদেশে কোচ, গারো প্রভৃতি পার্বত্য অসভ্য জাতি বাস করিত। জনপ্রবাদে প্রকাশ, বোকা নামক জনৈক প্রতাপশালী কোচের নামানুসারে এখানের

BanglaBook.org

নাম বোকাইনগর হইয়াছে। খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বারো ভুঁইয়াগণ কামরূপ রাজ্য বিভাগ করিয়া লন। কোনো কোনো ঐতিহাসিক কোচ ম্যাচ গারো প্রভৃতি বারোটি অসভ্য পার্বত্য জাতিকেই বারো ভুঁইয়া বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। ইহাদিগের দ্বারা কামরূপ ও গারো পর্বতের দক্ষিণভাগে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপিত হয়।

আমাদের উল্লিখিত দুর্গটি চতুর্দিকে প্রায় দশ হাত প্রশস্ত উচ্চ মাটির প্রাচীর এবং সুগভীর পরিখা দ্বারা বেষ্টিত ছিল এখনও স্থানে স্থানে প্রাচীরের চিহ্ন বিদ্যমান, কিন্তু পরিখা শুষ্ক হইয়া এখন শস্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। আড়াইশত বৎসর পূর্বে বিখ্যাত ব্রহ্মপুত্র নদ বোকাইনগরের পশ্চিমদিক দিয়া প্রবাহিত হইত। এখনও এমন দুই একটা পল্লিবৃদ্ধ জীবিত আছেন যাঁহারা ময়নমনসিংহ নগরের ছয়মাইল পূর্বে অবস্থিত রাজগঞ্জ গ্রামের পাশ দিয়া ব্রহ্মপুত্রকে প্রবাহিত হইতে দেখিয়াছেন। সে সময়ে ব্রহ্মপুত্রের এক ক্ষুদ্র শাখা কেল্লার ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইত, তাহা এখন 'বড়বিলা' নামে পরিচিত, বর্ষাকাল ব্যতীত অন্য সময়ে উহাতে জল থাকে না। ইহার উত্তর ও দক্ষিণ পাড়ে দুইটি করিয়া চারিটি প্রকাণ্ড মাটির স্তূপ বিদ্যমান আছে। স্থানীয় লোকেরা ওই গুলিকে 'বুরুজ' বলিয়া থাকে। পূর্বে উহাদের উপরিভাগে স্থাপিত কামান শ্রেণির ভিতর কালু ও কতু নামক অতি বৃহৎ দুইটি তোপ ছিল। দুর্গের ভিতর আরও কয়েকটি বুরুজের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। দুর্গের পার্শ্বে যে উচ্চ ভূমি দৃষ্ট হয়, পূর্বে ওই স্থানে কেল্লাদারের আবাসবাটি ও একটি দেওয়ানখানা প্রতিষ্ঠিত ছিল।

পূর্বে বোকাইনগরের কেল্লাদারের বিশেষ সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল, সেকালের ফৌজদারের ন্যায়—তাঁহারও সৈন্য থাকিত এবং তিনি প্রজাসাধারণের নিকট হইতে রাজসম্মানও লাভ করিতেন। কেল্লা হইতে বহির্গত হইবার সময় তাঁহার 'সম্মানার্থ আড়ানি, ছাতা তুরিভেরি প্রভৃতি সঙ্গে যাইত। দুর্গের ব্যবহারের জন্য গুলি, বারুদ ইত্যাদি নির্মাতাগণের বংশধরগণ অদ্যাপি এখানে হীনাবস্থায় অবস্থান করিতেছেন।

বাদ্‌শাহ শাহজাহানের সময়ে সাহিন খাঁ নামক জনৈক ব্যক্তির উপর দুর্গরক্ষার ভার ন্যস্ত ছিল। উহার প্রতিষ্ঠিত একটি মসজিদের দ্বারদেশে অর্ধ চন্দ্রাকারে 'লা এলাহা ইলাল্লা মহমদো রছুল আল্লা দরজমানে বাদ্‌শা শাহেজাহান' এই কথাগুলি পারস্য অক্ষরে খোদিত ছিল। বিগত ১৩০৪ সনের ভীষণ ভূমিকম্পে মসজিদটি ধ্বংসপ্রায় হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু স্থানীয় অধিবাসীগণের অর্থব্যয়ে উহা পুনঃ সংস্কৃত হইয়াছে। মসজিদের সম্মুখে একটি প্রাচীন দীর্ঘিকা আছে, বর্ষাকাল ব্যতীত অন্য সময়ে উহার জল ব্যবহারোপোযোগী হয় না। সাধারণের নিকট ইহা 'সহিন খাঁর তালাও' বলিয়া পরিচিত। সহিনখাঁ মুসলমান রীতি অতিক্রম করিয়া মস্‌জিদের পূর্বদিকে এই জলাশয় খনন করিয়াছিলেন, তাঁহার মাতা ও সহধর্মীগণ এই ধর্ম-বিগহিত কার্যে অশ্রদ্ধা প্রকাশ

BanglaBook.org

করায়, মসজিদের পশ্চিমভাগে আরও একটী পুষ্করিণী খনন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

মস্‌জিদের পশ্চিম দিকে একটি ক্ষুদ্র ভগ্নপ্রায় মঠ ও 'চাঁদ রায়ের তালাও' নামক আর একটি পুষ্করিণী বিদ্যমান। কিংবদন্তিতে প্রকাশ, ময়নমনসিংহ পরগনার বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ জমিদারগণের পূর্বপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরীর জ্যেষ্ঠপুত্র চাঁদ রায় উক্ত মঠ নির্মাণ করাইয়া উহাতে শিবলিঙ্গ স্থাপিত করেন এবং জলাশয়টিও তাহার দ্বারা খনিত হয়। আবার কাহারও কাহারও মতে চাঁদ রায় নামক জনৈক হিন্দু সন্ন্যাসী কর্তৃক ইহা নির্মিত হইয়াছিল। এসকল কিংবদন্তি হইতে প্রকৃত সত্যে উপনীত হওয়া অসম্ভব।

এই অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম প্রচারার্থ দিল্লি হইতে নিজামুদ্দিন আউলিয়া নামক একজন সিদ্ধ দরবেশ আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার কার্যে সহায়তা করিবার নিমিত্ত আরও সাতজন দরবেশকে তিনি সঙ্গে আনয়ন করেন। ইঁহারাই এদেশের নিম্নশ্রেণিস্থ হিন্দু ও কোচ গারো প্রভৃতি অসভ্য জাতিকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন। উক্ত মহাপুরুষ দুর্গের ভিতরই দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার সমাধি-ক্ষেত্র এ অঞ্চলে একটি পবিত্র স্থান বলিয়া পরিগণিত। কবরটি বহু পুরাতন বলিয়াই মনে হয়; কিন্তু উহার উপরে কোনও খোদিত লিপি দৃষ্ট হয় না। সমাধিটি নষ্ট হইয়া যাইবার উপক্রম হওয়ায় সাধারণের উদ্যোগে ইহার পুনঃসংস্কার সাধিত হইয়াছে। কিছু লেখা থাকিলেও সে সময়ে উহা লুপ্ত হওয়া সম্ভব।

সমাধিটি প্রাচীর বেষ্টিত, প্রাচীন প্রাচীরের কতকাংশ ও আলো দিবার প্রাচীন স্তম্ভটি অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। ওই স্থানে প্রতি শুক্রবারে বহুলোক সমবেত হইয়া উপাসনা করিয়া থাকে। সমাধির দক্ষিণভাগে একটি বড়ো প্রাচীন কূপ আছে, উহার জল এখনও পানার্থ ব্যবহৃত হয়। বট প্রভৃতি কতকগুলি বহু প্রাচীন বৃক্ষ স্থানটিকে ছায়া সুশীতল ও মনোরম করিয়া অতীত ঘটনাবলির সাক্ষীরূপে দণ্ডায়মান আছে। দরগার সম্মুখস্থ ভূমিতে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসের প্রত্যেক বৃহস্পতি ও রবিবারে একত্রে করিয়া মেলা হয়। এই সময়ে বহুদূর হইতেও অনেক যাত্রী উপস্থিত হইয়া থাকে।

কেল্লার ভিতর দিয়া যে নদী প্রবাহিত হইত, তাহার উপরিস্থ একটি সেতুর ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। যে স্থানে উহা অবস্থিত সে স্থানে নদী এখন শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। সেতুটি প্রাচীন বলিয়াই বোধ হয়। উহার প্রায় তিন ভাগ ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া গিয়াছে। বিগত ভূমিকম্পে স্থানে স্থানে ফাটিয়া গেলেও উহার সুদৃঢ় নির্মাণপ্রণালী প্রশংসনীয়।

মুসলমানাধিকারে আসিয়া বোকাইনগর শ্রীসম্পন্ন হইয়াছিল। কিল্লয়াদারের ও স্থানীয় অর্থশালী ব্যক্তিগণের উৎসাহে নানাবিধ শিল্পেরও বহুল উন্নতি হইয়াছিল। তৎকালে

BanglaBook.org

ওই স্থানের কাপড়, বেত্রের কারুকার্য ও নানাবিধ সুচিকার্য এ অঞ্চলে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। এখনও খলিফা-পটি, বেনে-পটি, তামাক-পটি প্রভৃতি নাম পূর্ব গৌরবের পরিচায়ক, কয়েক ঘর তন্তুবায় অদ্যাপিও এখানে বস্ত্র বয়ন দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছে। বর্তমান সময়ে এ স্থানের পূর্ব শিল্প-গৌরব-বৈভব পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়াছে।

সূত্র : শ্রী শৌরীন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী, *জাহ্নবী*, চতুর্থ বর্ষ, পৌষ ১৩১৫

২. যুগল কিশোরের দস্যু-দমন ও বিচার ফল

শতবর্ষ পূর্বে জমিদারগণ প্রজাগণের উপর এবং দুর্বল জমিদারের উপর কীরূপ ক্ষমতা পরিচালনা করিতেন যুগলকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয়ের দস্যুদমন হইতে আমরা সে বিষয়ের সুন্দর দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হই। বোধ হয় বর্তমান সময়ে বঙ্গের প্রায় সকল শিক্ষিত ব্যক্তির নিকটই গৌরীপুরের স্বনামধন্য জমিদার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী পরিচিত। যুগলকিশোর রায়চৌধুরী ইহারই বৃদ্ধ প্রপিতামহ। তিনি অত্যন্ত তেজস্বী ও দৃঢ়চেতা ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার প্রতাপে, বুদ্ধি চাতুর্যে ও কার্যকৌশলে তিনি ময়মনসিংহ অঞ্চলে আদর্শ জমিদাররূপে লোকের ভয় ও ভক্তির পাত্র ছিলেন। কর্তব্য পরায়ণতা তাঁহার রক্তের সহিত মিশ্রিত ছিল। একবার যাহা তিনি কর্তব্য বলিয়া স্থির করিতেন সহস্র বাধা ঘটিলেও তাহা হইতে বিরত হইতেন না। বাংলা ১১৯৫ সালে একবার ভীষণ জলপ্লাবন হইয়া লোকের ঘরদ্বার জলস্রোতে ভাসিয়া যায়। ওই সময় ময়মনসিংহ অঞ্চলে অনাহারে বহুলোকের জীবনান্ত ঘটিল। ভীষণ আর্তনাদে দেশ ভরিয়া উঠিল এবং বহু গ্রাম জনশূন্য হইল। ভগবানের এই কঠোর নিগ্রহে নিষ্পেষিত হইয়া লোক ধর্মাধর্ম ভুলিল। জীবিকানির্বাহের জন্য দস্যুতা করিতেও কুণ্ঠা বা দ্বিধা বোধ করিল না। অরাজকতার তাণ্ডবে ময়মনসিংহ অঞ্চল কম্পিত হইয়া উঠিল।

যুগলকিশোর রায়চৌধুরী বিপন্ন প্রজাগণের দুঃখ দূর করিবার জন্য যত্নের ত্রুটি করেন নাই। অর্থ ব্যয় করিয়াও তাহাদের সুখ ও সুবিধার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কঠোর হস্তে অত্যাচার পীড়নের পথরোধ করিয়া দেশে শান্তি স্থাপনের প্রয়াসী হইলেন। তাঁহার প্রতাপে দস্যু তস্কর দণ্ডিত ও দেশ হইতে তাড়িত হইতে লাগিল। অনেক স্থলের প্রজা

BanglaBook.org

পুনরায় শান্ত ও নিরুদবেগ হইয়া কৃষিকর্মে নিরত হইল। কেবল ময়মনসিংহ পরগনার পূর্বদিক সিংধা পরগনার প্রজাগণ সে সুখে বঞ্চিত হইল। সিংধা পরগনার গ্রামসমূহে অত্যাচারের পূর্ণস্রোত প্রবাহিত রহিল। এই অত্যাচার বারণের জন্য যুগলকিশোর বদ্ধ পরিকর হইলেন; কিন্তু ইহাতে এক নূতন বিভ্রাট উপস্থিত হইল।

সিংধা পরগনা যুগলকিশোরের সম্পত্তি নহে, মহম্মদ খাঁ নামক মুসলমান ভূম্যধিকারীর অধীন। সুতরাং সিংধার প্রজাগণের উপর তাঁহার কোনও ক্ষমতা ছিল না। সিংধার দুবৃত্ত প্রজাগণ প্রশ্রয় পাইয়া দলপুষ্ট হইতে লাগিল, বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া স্থানে স্থানে প্রজাগণের উপর নিত্য নূতন অত্যাচার আরম্ভ করিল। ক্রমশ অত্যাচারের বৃদ্ধি দেখিয়া যুগলকিশোর প্রায় পঞ্চ সহস্রাধিক লোক সমভিব্যাহারে ২৪ পৌষ সোমবার সিংধাভিমুখে ধাবিত হইলেন। সশস্ত্র সৈন্য ও লাঠিয়ালগণ জলোচ্ছাসের ন্যায় সিংধার মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। অচিরেই ভীষণ আর্তনাদে দেশ ভরিয়া গেল। সিংধার প্রজাগণের সর্বস্ব লুণ্ঠিত হইল। শস্যাদি ও দ্রব্যসামগ্রীসকল পদমর্দিত হইতে লাগিল। গো-ছাগাদি গৃহ পালিত পশুদল গৃহীত হইল। বালকবালিকা, যুবক যুবতী, বৃদ্ধ বৃদ্ধা অনেকে আবদ্ধ হইল। পরগনার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত প্রায় সমস্ত গৃহ অগ্নি দ্বারা ভস্মীভূত হইল। সাধু অসাধু দোষী নির্দোষী বিচার রহিল না, সকলের ভাগ্যচক্র একই গতিতে আবর্তিত হইল। নিগৃহীত নিষ্পীড়িত প্রজার আকুল আর্তনাদে সৈন্যগণ কেহ কর্ণপাত করিল না। এই ভীষণ অত্যাচারে ৩৬২ ঘর প্রজা ১২০০ গো-বৎসাদি এবং প্রজাগণের সংগৃহীত বহুপরিমাণ ধান্য ও বাসন পত্রাদি লইয়া সৈন্য ও লাঠিয়ালগণ যুগলকিশোরের নিজ পরগনায় আনয়ন করিল। কাণ্ডশূন্য উন্মত্ত পদাতিক লাঠিয়ালগণ শত শত পারিবারকে হস্তিপদের সহিত রজ্জুবদ্ধ করিয়া আনিল।

দস্যু তস্করের শাসনমাত্র উদ্দেশ্যে যুগলকিশোর এই অভিযান করিয়াছিলেন। তাহার পরিণাম যে এত ভীষণ অমানুষিক অত্যাচারে পরিণত হইবে তাহা তিনি পূর্বে মনে করিতে পারেন নাই। পাঁচ সহস্রের অথিক লোক কীভাবে কোথায় কি কার্য করিতেছে তাহা তিনি প্রথমে জানিতে পারেন নাই। নিরক্ষর অসভ্য যুদ্ধ ব্যবসায়ী লোক স্বাধীনভাবে অত্যাচার করিতে পাইয়া উন্মত্ত হইয়াছিল। তাহাদিগকে সংযত করা সহজ সাধ্য নহে। সুতরাং অল্প দিনের মধ্যেই সিংধার প্রজাগণের সর্বনাশ হইয়া গেল। যুগলকিশোর সমস্ত অবস্থা অবগত হইয়া অনুতপ্ত হইলেন। তিনি উৎপীড়িত প্রজাদিগকে আশ্রয় দিয়া নিজ অধিকার ময়মনসিংহ পরগনায় আনয়ন করিলেন। তাঁহাদের চাষের জন্য জমি বলদ বীজ প্রভৃতি প্রদান করিলেন। যুগলকিশোরের এই কাণ্ড অদ্যাপি ময়মনসিংহ অঞ্চলে প্রবাদ বাক্যরূপে প্রচলিত রহিয়াছে।

ময়মনসিংহ জেলার তৎকালীন কালেক্টার রটন সাহেবের নিকট সিংধার জমিদার

BanglaBook.org

মহম্মদ খাঁ যুগলকিশোরের অত্যাচার কাহিনি বিবৃত করিয়া অভিযোগ করিলেন। রটন সাহেব স্থানীয় তদন্তের জন্য আমীন কানন ও কাজী প্রভৃতিকে প্রেরণ করিলেন। অনুসন্ধানকারীগণ গ্রামে গ্রামে পরিভ্রমণ পূর্বক সমস্ত বিবরণ সংগ্রহ করিলেন, অত্যাচারে পীড়িত ব্যক্তিগণের নামধামসহ ক্ষতির তালিকা প্রস্তুত করিয়া যথাসময়ে রটন সাহেবের নিকট প্রেরিত হইল।

তখন ইংরেজ রাজত্বের প্রথমাবস্থা। তখন ব্রিটিশ শাসন সর্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত ও ব্রিটিশ শাসননীতি সর্বত্র প্রচলিত হয় নাই। মুসলমানরাজ প্রবর্তিত বিধি নিয়মই অনেকাংশে অক্ষুণ্ণ ছিল। কালেক্টরগণ জেলার প্রধান কর্মচারী হইলেও তাঁহাদের শক্তি অধিক ছিল না। বিভাগীয় শাসনকর্তা বিচার প্রভৃতি বিষয়ে অনেক সময় শক্তি পরিচালনা করিতেন। তাঁহাকেও আবার বহুবিষয়ে বোর্ডের আদেশাপেক্ষী হইয়া কার্য করিতে হইত। ময়নমনসিংহের কালেক্টার রটন সাহেব আমিনের রিপোর্টসহ ঢাকার শাসনকর্তা ডগলাস সাহেবের নিকট নিজ রিপোর্ট প্রেরণ করিলেন। ডগলাস সাহেব যুগলকিশোরের ন্যায় প্রবল পরাক্রান্তশালী জমিদারকে সাধারণ অপরাধীর ন্যায় দণ্ডিত করিতে সাহসী হইলেন না। কর্তৃপক্ষের আদেশানুসারে কার্য করাই সংগত ও নিরাপদ মনে করিলেন। তদনুসারে ডগলাস সাহেব ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে রেভিনিউ বোর্ডের নিকট যুগলকিশোর রায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্বন্ধে যে রিপোর্ট প্রেরণ করেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা গেল:

> The atrocious and violent proceedings of the Zeminder of Mymensing calls aloud for the most examplary and condign punishment; for if the principal land- holders are suffered, in open violation to all laws, to commit such daring outrages and if a total disregard to the repeated and positive orders of government, is allowed to pass over in silence, or with impunity, the most mischievous consequences are to be apprehended both for the peace of the District, the well being of its inhabitants and the safety of its revenues for many Zeminders or Talukders, will in future be liable to the wanton and licentious oppressions and lawless userpation of their more powerful neighbours.

ঢাকার শাসনকর্তার রিপোর্ট প্রাপ্ত হইয়া রেভিনিউ বোর্ডের সদস্যগণ যুগলকিশোরকে দণ্ড বিধান পূর্বক ওই প্রকার জমিদারগণের অত্যাচার সমূলে ধ্বংস করিতে কৃত নিশ্চয় হইয়া বিহিত আদেশ প্রদান করিলেন। এ দিকে যথা সময়ে যুগলকিশোর রায় ময়মনসিংহ শহরে নীত হইলেন। তাহার জন্য জামিন দিয়া মুক্তি প্রার্থনা করা হইয়াছিল কিন্তু তাহা প্রথমে গ্রাহ্য হয় নাই। তৎপর অর্থের মোহিনী শক্তিবলে অনেকেরই সহানুভূতি উথলিয়া উঠিল। যুগলকিশোরের ভাণ্ডার হইতে বহু অর্থ বিচার বিভাগসংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্র বড়ো কর্মচারীগণের

BanglaBook.org

ভাণ্ডার পূর্ণ করিল। ইহার ফলে যুগলকিশোর তাঁবুতে বাস করিবার অনুমতি পাইলেন। তাঁহার জন্য ভৃত্য পাচক প্রভৃতি নিযুক্ত হইল। প্রহরীবেষ্টিত হইয়াও তিনি স্বাধীনভাবে আমোদ আহ্লাদে সময়পাত করিয়া বিচারকালের জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

যথাকালে বিচার আরম্ভ হইল। প্রত্যহ শত শত লোক ময়মনসিংহের বিচারালয়ে উপস্থিত হইয়া বিচার কার্য দেখিতে লাগিল। ওই বিচারের কথাই লোকের একমাত্র আলাপের বিষয় হইল। সিংধার জমিদার সর্বস্ব পণ করিয়া মোকদ্দমার তদ্বির করিতে লাগিলেন। যুগলকিশোরের পক্ষ হইতেও তদ্বিষয়ের ত্রুটি হইল না। এইরূপে উভয় পক্ষের উকিল মোক্তারের উদর পূর্ণ হইতে লাগিল, সাক্ষীগণের মধ্যে অনেকেরই অবস্থার পরিবর্তন ঘটিল। অনেকে বিচারালয়ে উপস্থিত হইতে অস্বীকার করিল। যাহারা উপস্থিত হইল তাহাদের মধ্যে কেহ সত্য বলিল কেহ সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিল। যুগলকিশোরের ভয়ে অনেকেই তাঁহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে সাহসী হইল না। সম্ভ্রান্ত শ্রেণির কোনো লোকই সাক্ষ্য দিলেন না। ফলত লুণ্ঠন গৃহদাহ প্রভৃতি কার্য যে হইয়াছে তাহা প্রতিপন্ন হইল কিন্তু ওই সমস্ত কার্য যে যুগলকিশোর রায় কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহা কেহই শপথ করিয়া বলিতে পারিল না। যুগলকিশোর রায়কে কেহ দেখে নাই, তিনি যে আদেশ দিয়াছেন তাহাও কেহ শুনে নাই। কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাকে দণ্ডিত করা সংগত কিনা এই সম্বন্ধে উভয় পক্ষে বহু বাকবিতণ্ডা হইয়াছিল। পরিশেষে প্রমাণের অভাবে ও রটন সাহেবের অনুগ্রহে কেবলমাত্র জামিন প্রদান করিয়াই যুগলকিশোর অব্যাহতি লাভ করেন।

যদিও উপরোক্ত কার্যে যুগলকিশোর অপযশভাজন হইয়াছিলেন তথাপি তাঁহার ন্যায় সুবিবেচক ও বিষয় কার্যে নিপুণ লোক এখনও অতি অল্পই দেখা যায়। কালেক্টার রটন সাহেব বন্দোবস্ত রিপোর্টে লিখিয়াছিলেন:

> Jugal Roy manages his business and by his prudent care and abilities is a man of considerable property.

সূত্র: শ্রীশৌরীন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, *ভারতী*, অগ্রহায়ণ, ১৩১৬

BanglaBook.org

৩. Chapter II, Presidency College, 1855-1926

Soon after the formation of the Department of Public Instruction, the Director circularised (circulars Nos. 1753 to 1757, dated the 20th July 1856) that students of the College Department should thenceforward be designated as "of 1st, 2nd, 3rd and 4th Year, according to their standing, and that they be not in future distinguished by Classes V. In the opening year of the newly organised Presidency College (1855-1856), the General Branch contained 50 students in the 1st Year Class, 32 in the 2nd Year, 7 in the 3rd Year and 5 in the 4th Year ; the Law Branch, which was now placed on a separate footing, was composed of 25 students in the 1st Year Class, 4 in the 2nd Year and 9 in the 3rd Year. Out of the total of 132 students, 82 were paying students, 43 scholarship-holders and 7 free pupils. Five of these students were Christians; the remainder were Hindus. Four Muhammadan Junior scholars were brought over from the Madrassah, but they did not remain long.

The 2nd Year and 4th Year students were examined at the Town Hall by the Board of Examiners appointed by the Director of Public Instruction-the former for Senoir scholorships and the latter for their standing, and that they be not in future distinguished by Classes. In the opening year of the newly organised Presidency College (1855-1856), the General Branch contained 50 students in the 1st Year Class, 32 in the 2nd Year, 7 in the 3rd Year and 5 in the 4th Year; the Law Branch, which was now placed on a separate footing, was composed of 25 students in the 1st Year Class, 4 in the 2nd Year and 9 in the 3rd Year. Out of the total of 132 students, 82 were paying students, 43 scholarship-holders and 7 free pupils. Five of these students were Christians; the remainder were Hindus. Four Muhammadan Junior scholars were brought over from the Madrassah, but they did not remain long.

The 2nd Year and 4th Year students were examined at the Town Hall by the Board of Examiners appointed by the Director of Public Instruction–the former for Senoir scholarhips and the latter for Honours. The 1st and 3rd Year students were at the same time examined at the College Theatre by the officers of the college. In the Honours Examination of 1856, Bholanath Paul was awarded a medal for proficiency in Natural Philosophy and another in Mental and Moral Science, while Dwarkanath Chuckerburtty got a medal

BanglaBook.org

for proficiency in Literature. Senoir scholarships were awarded to several students of the General Branch.

The year 1855, approximately, initiates a period of transition in the educational history of Bengal. At about the same time as the opening of the Presidency College, a Committee was appointed by the Supreme Government to draw up a seheme for a University for the purpose of holding examinations and conferring degrees and honours. The scheme matured in 1856; and on the completion of their labours, the Calcutta University Committee were thanked by the Governor-General in Council in a Notification, dated the 12th December 1856. The first Entrance Examination of the University was held in March 1857, when 23 Presidency College students passed out successfully, 22 having been placed in the First Division and only one in the Second. Their names are given below:

1. Benerji, Dwarkanath.
2. Banerji, Nilmoni.
3. Basu, Bireswar.
4. Basu, Debendranarayan.
5. Basu, Jadunath.
6. Basu, Mahendranath.
7. Basu, Rajendranath.
9. Chatterji, Pratapchandra.
10. Datta, Priyanath.
11. De, Baikunthanath.
12. Ghose, Chandramadhab.
13. Ghose, Kalicharan.
14. Ghose, Srishchandra
15. Gupta ??

8. Supplementary, Ex-Students of Hindu College

Chatterjee, Baburam

B. A. 1873 (1st Division) : M. A. 1874 (I)

Chatterjee, Bankimchandra, Rai Bahadur,

Passed Entrance Examination in 1857 a graduates of the Calcutta University Collector. The greatest of Bengali modern Bengali prose. Author of nandini, etc. etc.

Chatterjee, Bipinbihari

B. A. 1874; B. L. 1876. Provineial Ju

BanglaBook.org

Chatterjee, Digamabar
M. A. 1881; B. L. 1882 (1st Class first Vakil in July, 1882. (After about the year and to Monghyr for about three about 1890). Judge, High Court in (Maliara, p. o., district Bankura)

Chatterjee, Ganapatinath
B. A. 1875 (1st Division)

Chatterjee, Gopalchandra
B. A. 1873; B. L. 1875

Chatterjee, Gopalchandra
B. A. 1877 (1st Division)

Chatterjee, Haridas
B. A. 1875 (1st Division); M. A. 1876 (2nd cal Seience) ; B. L. 1878 Pleader, K

Chatterjee, Harehkrishna
B. A. 1867; M. A. 1868 (1st in Sanskrit)

Chatterjee, Jadunath
B. A. 1860; B. L. 1861, Governemnt?

Chatterjee, Kalidhan
??, Second Grade Teachership Certificate, 1800

Ray, Ramaprasad
Student of Hindu College, 1831. Youngest son of Vakil, Calcutta High Court. Appointed Judge of the of appointment reaching him on the day of his death.

Ray Chaudhuri, Prasanna Chandra
Junior Scholarship, 1848

Rudra, Madhab Chandra
Government Senior Scholarship of Rs. 40, 1841-1842

Source:

Government of Bengal, Education Department, Presidency College Register

Complied and Edited by Surendra Chandra Majumdar, M.A.B.L
Professer Of History, Presidency College
and
Gokulnath Dhar, B.A.
Librarian, Presidency College

Calcutta

BanglaBook.org

৫. লালা বিজয়কুমার দে-র বংশতালিকা

↓

জৈনুদ্দিন আহমেদ খান + আমিনা বেগম

↓

নবাব সিরাজউদ্‌দৌলা + হীরা *(আলেয়া) [মোহনলালের বোন]*

↓

যুগলকিশোর রায়চৌধুরী, গৌরীপুর, ময়মনসিংহ

(১৭৫৮ অথবা ১৭৫৯ খ্রিস্টাব্দে গৌরীপুরের শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরীর ছোটো ছেলে কৃষ্ণগোপালের দত্তক পুত্ররূপে গৃহীত)

- হরকিশোর রায়চৌধুরী *(হরকিশোর ও শিবকিশোর যুগলকিশোরের প্রথম স্ত্রী রুদ্রাণী দেবীর পুত্র। তাঁর চার কন্যাও ছিল। শিবকিশোর অল্প বয়সেই মারা যায়)*
- শিবকিশোর রায়চৌধুরী
- প্রাণকৃষ্ণনাথ রায়চৌধুরী *(যুগলকিশোরের দ্বিতীয় স্ত্রী যমুনা দেবীর পুত্র)*

↓

প্রসন্নকুমার দে

(প্রাণকৃষ্ণনাথ রায়চৌধুরীর পুত্রের প্রথমে নাম ছিল শৌরীন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। পরে তাঁর নাম পরিবর্তন করে হয় প্রসন্নচন্দ্র রায়চৌধুরী ও পরে প্রসন্নকুমার দে। তিনি প্রসন্নচন্দ্র রায়চৌধুরী নামে যখন হিন্দু কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করেন, তখনই হিন্দু কলেজ প্রেসিডেন্সি কলেজে রূপান্তরিত হয়। তিনি প্রসন্নকুমার দে নামেই পরিচিত হন।)

- উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী *(প্রসন্নকুমারের প্রথম স্ত্রী ত্রিপুরেশ্বরী দেবীর গর্ভজাত)*
- বিজয়কুমার দে, হেমন্তকুমার দে এবং শৈলবালা *(প্রসন্নকুমারের দ্বিতীয় স্ত্রী মোহিনীর গর্ভজাত)*
  - দেবব্রত দে (অরুণ)
  - সুব্রত দে (বাপ্পা)

  (হেমন্তকুমারের স্ত্রী চারুলতা, রাঢ়িশাল, হবিগঞ্জ জেলার দুর্গাপ্রসন্ন সিংহ চৌধুরীর কন্যা ছিলেন। হেমন্তকুমার-চারুলতার পাঁচ কন্যা ছিল— কল্যাণী, গায়ত্রী, ইলা, রূপশ্রী ও শান্তশ্রী।)
- পূর্ণেন্দু, ঘনেন্দু, নীরেন্দু, শরদিন্দু, প্রশান্ত, মওয়ালকুমার এবং পারুলবালা *(প্রসন্নকুমারের তৃতীয় স্ত্রী হিরন্ময়ীর গর্ভজাত)*

BanglaBook.org

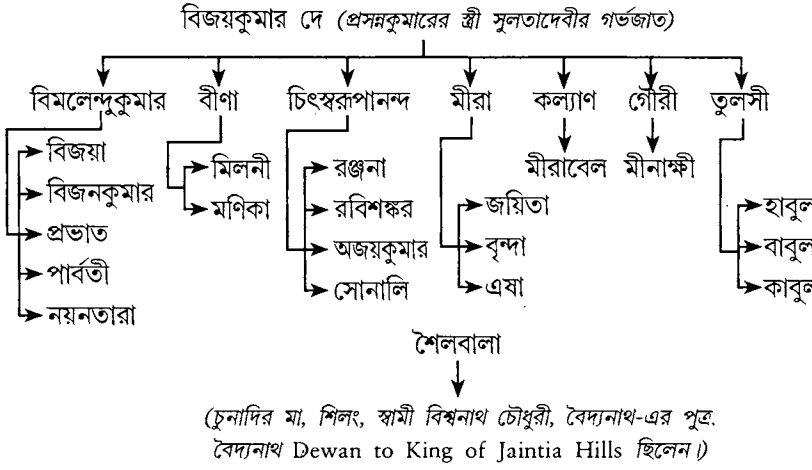

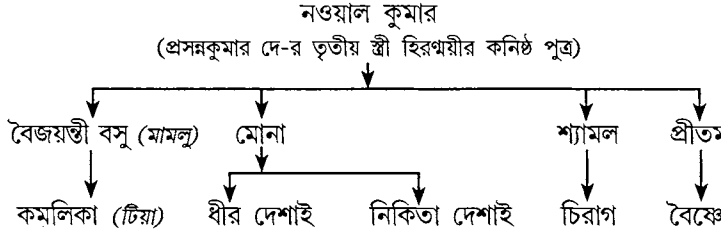

নোট : লালা বিজয়কুমার দে-র কনিষ্ঠপুত্র কল্যাণকুমার দে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি আমেরিকার নাগরিক। আমেরিকার ফ্লোরিডাতে তাঁর বাড়ি, ব্রিটেনের Wales-এও তাঁর বাড়ি আছে। কল্যাণ Delhi School of Economics এবং Harvard University-তে পড়াশোনা করেন, পণ্ডিত ব্যক্তি হিসেবে তাঁর খ্যাতি রয়েছে।

বিজয়কুমারের কন্যা বীণা সেন তাঁর নাতনির নাম রাখেন আলেয়া। বিজয়কুমারের নাতনি সোনালি Zia Khan-কে বিয়ে করেন, হায়দরাবাদের শিক্ষিত পরিবারের সন্তান। সোনালির শ্বশুর Professor Habibullah Khan জহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের International Law-এর অধ্যাপক, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে Pro-Vice-Chancellor ছিলেন। তিনি বহুবছর জার্মানিতে Environmental Law পড়াতেন।

বিজয়কুমারের নাতি রবিশঙ্কর Managing Director of SPS Shipping Ltd., Kolkata, Global Maritime industry-র একজন বিখ্যাত ব্যক্তি। তাঁর পুত্র বীরেন দে একজন বিখ্যাত অশ্বারোহী।

লালা বিজয়কুমার দে আফগান ব্যবসায়ীদের পক্ষে অনেক মামলা করায় এই ব্যবসায়ীরা তাঁকে গভীর শ্রদ্ধা করতেন। তিনি আরবি ও পুস্তু ভাষায় কথাবার্তা চালাতে পারতেন। প্রসন্নকুমার দে-র পুত্র হেমন্তকুমারের কন্যা ইলার ভাসুর ছিলেন চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহের কালার পাহাড়ের সশস্ত্র সংঘর্ষে শহিদ বিপ্লবী দেবপ্রসাদ গুপ্ত ও আন্দামান সেলুলার জেলের বন্দি বিপ্লবী আনন্দ গুপ্ত এবং পিসতুতো ভাসুর ছিলেন ওড়িশার জননেতা বিজু পট্টনায়ক।

বিজনকুমার দে-র বড়ো ছেলের পুরো নাম হল Atiar Singh Dey, Atiar দিল্লি ও লন্ডনে কাজ করেন। উল্লেখ্য বিজনকুমারের পিতা লালা বিমলেন্দুকুমার দে বিখ্যাত অশ্বারোহী ছিলেন, তাঁর একটি চমৎকার আস্তাবল ছিল। বিমলেন্দুকুমার ২০০১ খ্রিস্টাব্দের ১০ জুন প্রয়াত হন। শিলং-এ তাঁর শেষকৃত্যের সময়ে বড়ো নাতি Atiar উপস্থিত ছিলেন।

BanglaBook.org

প রি চি তি

মুর্শিদকুলি খাঁ-র অধীনে বাংলা

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকেই বাংলা, বিহার ও ওড়িশা ক্রমান্বয়ে একটি স্বাধীন প্রাদেশিক রাজ্যে পরিণত হয়। ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব মুর্শিদকুলি খাঁকে দেওয়ান নিযুক্ত করে বাংলায় পাঠান। মুর্শিদকুলি খাঁ অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে একজন বিচক্ষণ প্রশাসক ছিলেন। তিনি বাংলায় আসার আগে দাক্ষিণাত্যে প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মুর্শিদকুলি দক্ষিণ ভারতীয় ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। হাজী শফী ইস্পাহানি তাঁকে কিনে নিজের পুত্রের মতো পালন করেন এবং তাঁর নাম রাখেন মহম্মদ হাদি। বাংলায় দেওয়ান হিসেবে কৃতিত্ব প্রদর্শন করায় মুঘল সম্রাট তাঁকে 'মুর্শিদকুলি খাঁ' উপাধি দেন। তখন থেকে তিনি মুর্শিদকুলি খাঁ নামেই পরিচিত হন। দাক্ষিণাত্যেই মুর্শিদকুলি সৎ ও দক্ষ প্রশাসক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। আওরঙ্গজেব তাঁকে পছন্দ করতেন। তাই মুঘল প্রশাসনে তিনি দ্রুত উঁচু পদে ওঠেন। মুর্শিদকুলি দেওয়ান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করার পর বাংলার প্রশাসনের প্রধান কেন্দ্র জাহাঙ্গির নগর (ঢাকা) যান। তখন মহম্মদ আজিম আল-দিন ছিলেন বাংলার সুবাদার। কিন্তু তিনি মুর্শিদকুলিকে সুনজরে দেখেননি। নিজের নিরাপত্তা ও কাজের সুবিধার জন্য মুর্শিদকুলি তাঁর দেওয়ানি কার্যালয় ঢাকা থেকে মকসুদাবাদে স্থানান্তরিত করেন। তাঁর নাম অনুসারে মকসুদাবাদের নাম হল মুর্শিদাবাদ।

দীর্ঘ সাতাশ বছর মুর্শিদকুলি বাংলার প্রশাসনের বিভিন্ন পদে ছিলেন। ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭২৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মুর্শিদকুলি বাংলার সুবাদার ছিলেন। তা ছাড়া তিনি দীর্ঘকাল ওড়িশার সুবাদার ছিলেন। কয়েক বছর মুর্শিদকুলি বিহারের দেওয়ান

BanglaBook.org

ছিলেন। তিনি কখনো মুঘল সাম্রাজ্যের রাজনীতিতে নেতৃত্বের বিরোধে অংশগ্রহণ করেননি। তিনি বাংলার প্রশাসক হিসেবে আঞ্চলিক সমস্যা নিয়েই ব্যস্ত থাকেন এবং ভূমিব্যবস্থার সংস্কার করে এক নতুন ভূম্যধিকারী শ্রেণি সৃষ্টি করেন। ১৭২৭ খ্রিস্টাব্দের ৩০ জুন মুর্শিদকুলি খাঁ মারা যান।

(vide *The History of Bengal*, vol II)

সুজাউদ্দীন মহম্মদ খাঁ (১৭২৭-১৭৩৯ খ্রিস্টাব্দ)

মুর্শিদকুলি খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর জামাতা সুজাউদ্দীন তাঁর উত্তরাধিকারী হিসেবে বাংলা ও ওড়িশার সুবাদার হন। কয়েক বছরের মধ্যে তিনি বিহারেরও সুবাদার হন। এইভাবে মুঘল সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলের তিনটি সুবা বংশানুক্রমিক শাসকদের অধীনে একই রাজ্যে পরিণত হল এবং এখানকার শাসকরা দিল্লির সম্রাটদের প্রতি শুধু মৌখিক আনুগত্য প্রদর্শন করেন। সকল বিষয়ে তাঁরা স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করেন। (ibid)

সরফরাজ খাঁ (১৭৩৯-১৭৪০ খ্রিস্টাব্দ)

সুজাউদ্দীনের পুত্র সরফরাজ খাঁ খুবই অল্পদিন রাজত্ব করেন। নবাব হিসেবে তাঁর দক্ষতা ছিল না। তাঁরই অধীনস্থ কর্মচারী আলিবর্দি খাঁ ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দে গিরিয়ার যুদ্ধে তাঁকে পরাজিত ও নিহত করে বাংলা, বিহার ও ওড়িশার মসনদে বসেন। (ibid)

আলিবর্দি খাঁ (১৭৪০-১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দ)

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিদেশি মুসলমানেরা ভবিষ্যতে লাভের আশায় ভারতে এসে প্রশাসনের উচ্চ স্থানে বসেন। তাঁদের মধ্যে কেউ সুবাদার, নায়েব-সুবাদার হন। এই শতাব্দীর প্রারম্ভে টুর্কো-আরব (Turko-Arab) বংশজাত আলিবর্দি এই আশায় বাংলায় আসেন। আলিবর্দির প্রকৃত নাম ছিল মীর্জাবন্দে অথবা মীর্জা মহম্মদ আলি। আলিবর্দির ঠাকুরদা বংশের দিক থেকে আরব ছিলেন, সম্রাট আওরঙ্গজেবের foster-brother এবং একজন মুঘল মনসবদার পদে উন্নীত হন। আলিবর্দির পিতা মীর্জা মহম্মদ জীবন শুরু করেন সম্রাট আওরঙ্গজেবের তৃতীয় সন্তান আজম শাহ-র ভোজোৎসবের একজন পরিচারক হিসেবে, যাকে পেয়ালায় মদ ঢেলে দিতে হত। আলিবর্দির মা ছিলেন খোরাসানের আফসার উপজাতি গোষ্ঠীর। মুর্শিদকুলির জামাতা সুজাউদ্দীন মহম্মদ খাঁর সঙ্গে আলিবর্দির মায়ের আত্মীয়তা ছিল। মীর্জা মহম্মদের পুত্রদের আজম শাহ স্নেহ করতেন।

BanglaBook.org

মীর্জা মহম্মদ আলি (আলিবর্দি) কঠোর পরিশ্রম করে সুজাউদ্দীন পরিচালিত প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে জনপ্রিয় করে তোলেন। বাংলার মসনদে তাঁর আসনকে সুদৃঢ় করতেও আলিবর্দি সাহায্য করেন। ১৭২৮ খ্রিস্টাব্দে সুজাউদ্দীন আলিবর্দিকে ফৌজদার নিযুক্ত করেন। আলিবর্দির ভাগ্য খুব প্রসন্ন হল। তাঁকে বিহারে ডেপুটি গভর্নর নিযুক্ত করা হল। ১৭৩৩ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির সম্রাট বিহারকে বাংলার সঙ্গে যুক্ত করেন। ওই বছরই আলিবর্দি আজিমাবাদে যান। তাঁর সঙ্গে পাঁচ হাজার সৈনিক ও লোকজন ছিল, আর ছিল দুজন জামাতা। আলিবর্দির সদ্যজাত নাতি মীর্জা মহম্মদ (পরে নবাব সিরাজ-উদ্‌দৌলা) এবং আরও কয়েকজন আত্মীয় আলিবর্দির সঙ্গে ছিল। সুজাউদ্দীন দিল্লি থেকে আলিবর্দির জন্য নতুন পদবী 'মহবৎজঙ্গ' সংগ্রহ করেন এবং আলিবর্দিকে পাঁচ হাজারী মনসবদার করা হয়। তখন বিহারে খুব বিশৃঙ্খলা ছিল। আলিবর্দির সুশাসনের ফলে বিহারে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে এল। সুজাউদ্দীনের সাহায্যে আলিবর্দির ক্ষমতা ও প্রভাব বৃদ্ধি পেল।

সুজাউদ্দীনের পুত্র সরফরাজ খাঁর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে আলিবর্দি ক্ষমতা দখলের অভিলাষী হন। আলিবর্দির ভাই হাজি আহমদ ও ব্যাঙ্কের মালিক জগৎ শেঠের সাহায্যে সরফরাজ খাঁর বিরুদ্ধে আলিবর্দি বিদ্রোহ করেন এবং তাঁকে রাজমহলের নিকট গিরিয়াতে পরাজিত ও নিহত করার পর ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দে আলিবর্দি ক্ষমতা দখল করেন। তিনি বাংলা, বিহার ও ওড়িশার নবাব হিসেবে মসনদে বসেন। মুঘল সাম্রাজ্যের অধঃপতনের যুগে ১৭৩৯-১৭৪০ খ্রিস্টাব্দের বাংলার বিপ্লবকে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা হিসেবে অভিহিত করা হয়। আলিবর্দি সুজাউদ্দীনের সমর্থনে প্রশাসনে উচ্চপদে বসে যেভাবে তাঁর পুত্র সরফরাজ খাঁকে ক্ষমতাচ্যুত ও হত্যা করেন তা নিন্দনীয় ছিল। এই সময়ে রাজনীতির ক্ষেত্রে বিশ্বাসঘাতকতা, অকৃতজ্ঞতা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা সমগ্র পরিবেশকে অপবিত্র করে তোলে।

গিরিয়া যুদ্ধের পর বাংলা আলিবর্দির দখলে আসে। তারপর তিনি ওড়িশাকে তাঁর অধীনস্থ করেন। কিন্তু আলিবর্দি শান্তিতে রাজত্ব করতে পারেননি। একদিকে মারাঠাদের আক্রমণ, অন্যদিকে আলিবর্দির আফগান সৈন্যরা ১৭৪৫ ও ১৭৪৮ খ্রিস্টাব্দে বিদ্রোহ করে। তার ফলে ব্যাবসাবাণিজ্যের খুব ক্ষতি হয়। ১৭৫১ খ্রিস্টাব্দের মে অথবা জুন মাসে আলিবর্দি মারাঠাদের সঙ্গে চুক্তি করে, মারাঠা আক্রমণের ফলে বাংলার যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল তা দূর করে প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে উন্নত করতে চেষ্টা করেন। ১৭৫১ খ্রিস্টাব্দে নবাব আলিবর্দির বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। সুতরাং বৃদ্ধ বয়সে তাঁর পক্ষে প্রদেশের সমস্যা সমূহের সমাধান করা সম্ভব হয়নি। পরিবারের কয়েকটি মৃত্যুর ঘটনা তাঁকে ভয়ানক অখুশি করে। এইসব ঘটনায় তিনি বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়েন এবং ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১০ ফেব্রুয়ারি শোথরোগে আক্রান্ত হন। ১০ এপ্রিল ৮০ বছর বয়সে তিনি মারা যান।

BanglaBook.org

১৭৪০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আলিবর্দি কার্যত স্বাধীন শাসক হিসেবে বাংলা শাসন করেন। তিনি ইউরোপীয় বণিকদের বৈধ বাণিজ্য করতে বাধা দেননি। আলিবর্দি শুধু মারাঠাদের আক্রমণের সময়ে ইংরেজ বণিকদের কাছ থেকে সাধারণ শুল্কের চেয়ে বেশি অর্থ দাবি করেন, অন্য কোনো সময়ে তা দাবি করেননি। অবশ্য নবাব হিসেবে তিনি নিজের অধিকার সম্বন্ধে খুব সচেতন ছিলেন। তাই তিনি ইংরেজ ও ফরাসিদের বাংলায় সামরিক ঘাঁটি নির্মাণের অনুমতি দেননি।

সেই সময়ে ব্যক্তিগত জীবনে প্রচলিত সমস্ত রকম অধার্মিকতা থেকে আলিবর্দি মুক্ত ছিলেন। অল্পবয়সে তাঁকে কঠোর পরিশ্রম করে নিজের জীবন গড়ে তুলতে হয়। স্বভাবতই তিনি আচারনিষ্ঠ মেজাজের মানুষ ছিলেন। তাঁর লাম্পট্য ও পানাসক্তি ছিল না। তিনি ঈশ্বরবিশ্বাসী মানুষ ছিলেন। অবসর সময় ধর্মগ্রন্থ ও ইতিহাস গ্রন্থ পড়তেন। তিনি নিয়মিত নামাজ পড়তেন। তাঁর একই স্ত্রী ছিল। তিনি দয়ালু ব্যক্তি ছিলেন। প্রশাসনিক ব্যবস্থার যাবতীয় খবর রাখতেন। প্রথম জীবনে যাঁদের কাছ থেকে তিনি সাহায্য পেয়েছিলেন তাঁদের কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে মনে রেখেছেন এবং সেইসব পুরোনো বন্ধুদের সাহায্যও করতেন। আলিবর্দির দরবারে পণ্ডিত ব্যক্তিরা সম্মানিত ছিলেন। তিনি নিজেও জ্ঞানচর্চায় আনন্দ লাভ করতেন। তাঁর সময়ে আজিমাবাদ (পাটনা) পারস্য ভাষা ও সংস্কৃতি শিক্ষার অন্যতম কেন্দ্র ছিল এবং পারস্য দেশ থেকেও জ্ঞানীব্যক্তিরা এখানে বাস করতেন। সুতরাং আলিবর্দির সময়কালে বাংলা শিক্ষা-সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল। আলিবর্দি নিজে একজন সাহসী যোদ্ধা ছিলেন।

আলিবর্দির কোনো পুত্র ছিল না। তাঁর তিন কন্যা ছিল। আলিবর্দির এই তিন কন্যার বিবাহ হয়েছিল তাঁর ভাইয়ের তিন সন্তানের সঙ্গে। তাঁরা ঢাকা, পূর্ণিয়া ও পাটনার গভর্নর ছিলেন, অবশ্য এই গভর্নরদের ঢাকার নবাব, পূর্ণিয়ার নবাব ও পাটনার নবাব বলা হত। আলিবর্দির জীবিতকালেই তাঁর তিন কন্যা বিধবা হন। আলিবর্দির বড়ো মেয়ের নাম ছিল মিহিরউননিসা (ঘসেটি বেগম)। এই কন্যার কোনো সন্তান ছিল না। আলিবর্দির দ্বিতীয় মেয়ের বড়ো সন্তানের নাম ছিল সৌকতজঙ্গ এবং ছোটো সন্তানের নাম ছিল মীর্জা রমজানি। আলিবর্দির তৃতীয় মেয়ে আমিনা বেগমের দুটি সন্তান ছিল, সিরাজ-উদ্‌দৌলা ও মীর্জা মাহদি। সিরাজ ছিলেন আলিবর্দির সবচেয়ে আদরের নাতি। আলিবর্দি ১৭৩৩ খ্রিস্টাব্দে বিহারের ডেপুটি গভর্নর হন, তার কিছুদিন আগে সিরাজের জন্ম হয়। সিরাজের আবির্ভাব আলিবর্দির প্রতিপত্তি বৃদ্ধির কারণ হিসেবে উল্লেখিত হয়। পারস্য দেশ থেকে আগত ভাগ্যান্বেষী আলিবর্দি ১০০ টাকা মাসিক বেতনে ওড়িশাতে কাজ শুরু করে তিন রাজ্যের অধিপতি হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। এ তো মস্তবড়ো সৌভাগ্যের কথা। সিরাজের আবির্ভাব এই বার্তাকেই বহন করত, তাই আলিবর্দির একান্ত আদরের নাতি তিনি হন। তাঁর এই নাতিই হবে তাঁর উত্তরাধিকারী, এই

অবস্থা আলিবর্দির পরিবারের কয়েকজন মেনে নিতে পারেননি। তাই সিরাজউদ্‌দৌলাকে বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়।

(Ibid; vide also Sachchidananda Bhattacharya, *A Dictionary of Indian History*, First published 1967, Calcutta, Second Edition 1972)

সিরাজউদ্‌দৌলা (১৭৫৬-১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ)

১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১০ এপ্রিল যখন আলিবর্দি মারা যান সিরাজ ও সৌকতজঙ্গ দুজনেই বাংলা, বিহার ও ওড়িশার মসনদের দাবিদার হলেন। কিন্তু সৌকতজঙ্গ ছিলেন পূর্ণিয়াতে। তিনি তখন ছিলেন পূর্ণিয়ার গভর্নর। সিরাজের সবচেয়ে বড়ো শত্রু ছিলেন তাঁর মায়ের বড়ো বোন ঘসেটি বেগম। তিনি ছিলেন সন্তানহীন বিধবা। মুর্শিদাবাদের কয়েক মাইল উত্তরে মোতিঝিল-এ সুরক্ষিত প্রাসাদে ঘসেটি বেগম থাকতেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল সিরাজের ছোটো ভাই আক্রামউদ্‌দৌলা মসনদে বসবেন এবং দেশ শাসন করবেন তাঁর প্রতিনিধিরূপে। কিন্তু তিনি মারা যান আলিবর্দির মৃত্যুর একবছর আগে। তখন ঘসেটি বেগম সৌকতজঙ্গকে মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করতে বলেন। সিরাজের শত্রুরা সবাই এই মহিলার সাহায্য পান। যখন আলিবর্দির মৃত্যু আসন্ন হয় তখন মসনদের অধিকার নিয়ে যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি হল। কিন্তু সিরাজের ভয়ংকর শত্রু ছিলেন আলিবর্দির সেনাবাহিনীর কমান্ডার-ইন-চিফ মিরজাফর আলি খাঁ। মিরজাফর কপর্দকহীন অবস্থায় ভারতে এসেছিলেন এবং আলিবর্দি তাঁর সৎ বোন শাহ খানমের সঙ্গে মিরজাফরের বিবাহ দেন। তারপর থেকে মিরজাফর ক্রমশ প্রশাসনের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হন। এইভাবে শত্রু পরিবেষ্টিত অবস্থাতেই সিরাজ ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে মসনদে বসেন।

প্রথমেই সিরাজ ঘসেটি বেগমকে দমন করে তাঁকে বন্দি করেন। ইতিমধ্যে সিরাজ তাঁর অনুগত ব্যক্তিদের গুরুত্বপূর্ণ পদে বসান। বিশ্বাসঘাতক মিরজাফরকে সেনাবাহিনীর প্রধান পদ (bakshi) পদ থেকে সরিয়ে দিয়ে মিরমদনকে সেই দায়িত্ব দেন। আর একজন বিশ্বস্ত ও দক্ষ অফিসার ছিলেন কাশ্মীর থেকে আগত মোহনলাল। তাঁকে সিরাজ দিওয়ানখানার পেসকার (Peshkar) এবং মোহনলালকে 'মহারাজা' পদবীতে ভূষিত করেন। প্রভাবের দিক থেকে মোহনলাল প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পান। ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসেই সিরাজ প্রশাসনিক পরিবর্তন সম্পন্ন করে নিজের অবস্থাকে সুরক্ষিত করেন।

পূর্ণিয়ার গভর্নর সৌকতজঙ্গ সিরাজের উত্তরাধিকার অস্বীকার করে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। সিরাজ সৌকতজঙ্গকে পরাজিত ও নিহত করেন। এইভাবে সিরাজ বাংলা, বিহার ও ওড়িশার নবাব হিসেবে নিজের অবস্থা সুদৃঢ় করেন। তারপর তাঁকে

BanglaBook.org

ইংরেজ কোম্পানির প্রতি দৃষ্টিনিবদ্ধ করতে হয়। কলকাতায় যেসব ইংরেজ বণিক ছিল, তারা সিরাজের সিংহাসন আরোহণকে স্বাগত জানায়নি। বাংলায় ইংরেজদের কুঠির প্রধান ছিলেন রোজার ড্রেক (Roger Drake)। ইংরেজ বণিকরা শুধু নবাবকে অগ্রাহ্য করেনি, তারা রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণবল্লভকে কলকাতায় আশ্রয় দেয়। রাজবল্লভ সরকারি অর্থ তছরূপ করেন, এমন অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে ছিল। সিরাজ ইংরেজদের কৃষ্ণবল্লভকে ছেড়ে দিতে বলেন। ইংরেজরা এই দাবি মেনে নিল না, উপরন্তু নবাবের দূতকে কলকাতা থেকে বিতাড়িত করে। তা ছাড়া ইংরেজরা শর্ত লঙ্ঘন করে কলকাতায় সামরিক ঘাঁটি করে। এই অবস্থায় সিরাজউদ্‌দৌলা ইংরেজদের দমন করতে অগ্রসর হন। প্রথমে সিরাজ কাশিমবাজারের কুঠি দখল করেন। তারপর তিনি ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দের ৫ জুন কলকাতা অভিযানে রওনা হন এবং ১১ দিনের মধ্যে ১৬০ মাইল অতিক্রম করে কলকাতার বহিঃপার্শ্বে ১৬ জুন উপস্থিত হন। নবাবের সৈন্যবাহিনী কলকাতা আক্রমণ করে এবং ২০ জুন কলকাতা দখল করে। বেশিরভাগ ইংরেজ যারা কলকাতায় ছিল তারা জাহাজে করে নদী দিয়ে পালিয়ে যায় এবং কিছু ইংরেজ কলকাতায় ছিল। হলওয়েল চেষ্টা করেও কলকাতা রক্ষা করতে পারেননি। এই সময়েই তথাকথিত অন্ধকূপ হত্যার ঘটনা (Black Hole Tragedy) হয়। হলওয়েল বলেন, নবাব কলকাতা দখল করার পর ২০ জুন রাতে একটি ছোটো কক্ষে ১৪৬ ইংরেজকে বন্দি করে রাখেন, তার পরের দিন সকালে মাত্র ২৩ জন জীবিত ছিল। সবাই দম বন্ধ হয়ে মারা যায়। গবেষণায় জানা যায় বন্দিদের সংখ্যা ৬০ জন ছিল আর এই ঘটনায় নবাবের কোনো ব্যক্তিগত দায়িত্ব ছিল না।

সিরাজ কলকাতা জয় করলেন বটে, তিনি পলাতক ইংরেজদের ফলতা পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে তাদের ধ্বংস করতে ব্যর্থ হন। এমনকী নবাব কলকাতাকে সুরক্ষিত করার ব্যবস্থাও করতে পারেননি। সিরাজ কর্তৃক কলকাতা দখলের খবর মাদ্রাজে পৌঁছোল। রবার্ট ক্লাইভ ও ওয়াটসনের নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী সামরিক ও নৌবাহিনী বাংলায় এল। নবাবের দিক থেকে কার্যত কোনো বাধা না-পেয়ে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে পুনরায় ইংরেজরা কলকাতা দখল করেন। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ৯ ফেব্রুয়ারি নবাবের সঙ্গে ইংরেজদের চুক্তি হল, তার নাম আলিনগরের সন্ধি। সন্ধির শর্ত অনুযায়ী নবাব ইংরেজদের বাণিজ্যের অধিকার স্বীকার করেন, কলকাতা সুরক্ষিত করবার ও মুদ্রা প্রচলনের অধিকার দেন। তার ফলে ইংরেজদের ক্ষমতা খুবই বৃদ্ধি পেল।

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে ক্লাইভ চন্দননগর দখল করেন। তার ফলে ফরাসিরা বাংলায় ইংরেজদের কোনো ক্ষতি করতে সক্ষম ছিল না। সিরাজ কোনো সুনির্দিষ্ট নীতি অনুসরণ করতে না-পারায় ইংরেজের ক্ষমতা বৃদ্ধির পথ প্রশস্ত হয়। আহম্মদ শাহ আবদালী পূর্বদিকে এগুতে পারেন এই গুজব রটায়, নবাব ইংরেজদের অসন্তুষ্ট

BanglaBook.org

করতে চাননি। আহম্মদ শাহ আবদালী দিল্লি থেকে চলে যাবার পর সে ভয় চলে গেল এবং সিরাজের নীতিতে পরিবর্তন দেখা দিল। চন্দননগর ক্লাইভ দখল করার পর ল ও আরও কয়েকজন ফরাসি কাশিমবাজারে আশ্রয় নেন। সিরাজ তাঁদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন। এমনকী তিনি সাহায্য চেয়ে হায়দরাবাদে বুসীকেও খবর দেন। ইংরেজরা নবাবের আচরণে শঙ্কিত হয়। তাই ইংরেজরা সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করতে চেষ্টা করে। নবাবের আচরণে ধনকুবের জগৎশেঠ, প্রাক্তন দেওয়ান রায়দুর্লভ, সেনাপতি মিরজাফর ও ইয়ার লতিফ খাঁ ক্ষুব্ধ ছিলেন। জগৎশেঠ ও কাশিমবাজার ইংরেজ কুঠির উইলিয়াম ওয়াটস সিরাজের বিরুদ্ধে অন্যতম ভূমিকা পালন করেন। স্যার যদুনাথ সরকারের মতে, এই ষড়যন্ত্রের অন্যতম দক্ষ নায়ক ছিলেন ওয়াটস।

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসের শেষেই কলকাতা কাউন্সিল প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি পায়, বিশেষ করে মিরজাফরের। ১মে কলকাতা কাউন্সিল মিরজাফরের সঙ্গে গোপন চুক্তিতে সম্মতি জানায়। এই চুক্তিতে ঠিক হল মিরজাফরকে সিংহাসনে বসানো হবে। কলকাতায় কোম্পানির সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। এই চুক্তির শর্তে নবাবকে ইংরেজের নিয়ন্ত্রণাধীন করা হল। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে চুক্তি চূড়ান্ত রূপ পেল। ওয়াটস ৫ জুন গোপনে মিরজাফরের সঙ্গে দেখা করেন। মিরজাফর এই চুক্তিকে সমর্থন করে শপথ নেন। ১১ জুন এই চুক্তি কলকাতার সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো হয় এবং ১২ জুন ওয়াটস ও তাঁর সঙ্গীরা মুর্শিদাবাদ থেকে পলায়ন করেন। ১৩ জুন ক্লাইভ ৮০০ ইউরোপীয় সৈন্য এবং ২২০০ সিপাহিসহ মুর্শিদাবাদ অভিমুখে রওনা হন। ২২ জুন ইংরেজ সেনাবাহিনী গঙ্গা অতিক্রম করে মধ্যরাতে নদিয়া জেলার পলাশিতে উপস্থিত হয়। বৃষ্টি ও গরমের মধ্যে এই সেনাবাহিনীকে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে শত্রুর সম্মুখীন হতে হয়। অন্যদিকে নবাব পলাশি নামক গ্রামে ৫০,০০০ সৈন্য নিয়ে উপস্থিত হন।

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জুন বৃহস্পতিবার সকাল আটটায় উভয় পক্ষই তাদের অবস্থান থেকে যুদ্ধ আরম্ভ করে। প্রথমে নবাবের পক্ষে ফরাসি সৈন্যরা গোলা বর্ষণ করে। আধঘণ্টার মধ্যেই ৩০ জন ব্রিটিশ নিহত ও আহত হয়। ১১টার কিছু পরে বজ্রপাতসহ ভয়ানক বৃষ্টি হয়। তার ফলে পলাশির প্রান্তর কর্দমাক্ত হয়। নবাবের গোলন্দাজ বাহিনীর কামানের বারুদ ঢেকে না-রাখার ফলে বৃষ্টিতে ভিজে যায় এবং বারুদ অকেজো হয়ে পড়ে। অন্যদিকে ইংরেজ সেনাবাহিনী যত্ন করে তাদের বারুদ শুষ্ক রাখে। বৃষ্টি থামার পর মিরমদন যখন ইংরেজ সৈন্যদের আক্রমণ করেন তখন অল্পদূরত্ব থেকে ইংরেজদের গোলাবর্ষণ নবাবের সৈন্যদের বিপন্ন করে। মিরমদন ও আরও কয়েকজন নবাবপক্ষের সেনাপতি নিহত হন। তখন বেলা দুটো বাজে। নবাবের সেনাপতিরা মিরজাফর, ইয়ার লতিফ ও রায়দুর্লভ বিশ্বস্ততার সঙ্গে দায়িত্ব পালন না-

BanglaBook.org

করায় নবাবের বিশাল সেনাবাহিনী পরাজিত হয়। ক্লাইভ জয়ী হলেন। চারটের সময়ে নবাব নিজেও যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যান। মধ্যরাতে তিনি মুর্শিদাবাদ এসে পৌঁছোন।

মুর্শিদাবাদে ভয়ানক আতঙ্ক ও বিভ্রান্তি। আত্মরক্ষার কোনোই ব্যবস্থা নেই। সিরাজ বিশ্বাসযোগ্য কাউকে পেলেন না। তাঁর পরিবারের আতঙ্কগ্রস্ত মহিলাদের পরামর্শে সিরাজ-উদ্‌দৌলা পাটনার উদ্দেশ্যে রওনা হন। ২৪ জুন রাতে সকলের অগোচরে সিরাজ তাঁর একজন বিশ্বস্ত খোঁজা পুরুষ এবং স্ত্রী লুৎফুন্নেসা বেগমকে নিয়ে রাজধানী পরিত্যাগ করেন। সেখানে শাসন করবার কেউ ছিলেন না। যুদ্ধের পর মিরজাফর শহরে ফিরে আসলেও নিজেকে তাঁর বাড়িতে আবদ্ধ রাখলেন এবং সরকারের দায়িত্ব নিতে আগ্রহ প্রকাশ করেননি। ক্লাইভ মুর্শিদাবাদ পৌঁছোলেন ২৯ জুন এবং সিরাজের রাজপ্রাসাদের কাছে মুরাদবাগে অবস্থান করেন। বিকেলে তিনি হীরাঝিল প্রাসাদে গেলেন, সেখানে মিরজাফর ছিলেন। সেখানে সকল রাজা এবং দরবারের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে ক্লাইভ মিরজাফর আলি খাঁকে হাত ধরে মসনদে বসিয়ে দেন এবং তাঁকে স্যালুট করেন তিনটি সুবার নবাব হিসেবে। উপস্থিত সবাই তাঁকে অভিনন্দন জানান এবং আনুগত্য প্রদর্শন করেন। এই ঘটনা উল্লেখ করে স্যার যদুনাথ সরকার মন্তব্য করেন:

> Thus ended Muslim rule in Bengal; the foreign master of the sword had become its king-maker.

সিরাজ স্থলপথে পদ্মা নদীর ধারে ভগবানগোলা গেলেন এবং একটি নৌকায় পাটনার উদ্দেশ্যে রওনা হন, তাঁর মিত্র ফরাসিদের আশ্রয়ে থাকার জন্য। ৩০ জুন রাজমহলে নৌকা থেকে নেমে তাঁর আহারের ব্যবস্থা করতে বলেন। যদিও তিনি মলিন পোশাকে ছদ্মবেশে ছিলেন, দানা শাহ নামে একজন মুসলিম ফকির তাঁকে চিনতে পারেন। সিরাজ ক্ষমতায় থাকাকালীন একসময়ে তাঁর কান ও নাক কাটার আদেশ দিয়েছিলেন। এই ফকির রাজমহলের গভর্নরকে খবর দেন। তিনি সিরাজকে গ্রেফতার করে প্রহরীসহ মুর্শিদাবাদে পাঠিয়ে দেন। খুব গোপনীয়তা অবলম্বন করে ২ জুলাই রাতে সিরাজকে নিয়ে আসা হল।

মিরজাফর বন্দি সিরাজকে নিয়ে কী করবেন তা নিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত করতে পারেননি। সিরাজকে পুত্র মিরন-এর হাতে দিয়ে তিনি ঘুমোতে গেলেন। এই নৃশংস যুবক ২ জুলাই রাতেই কারাগারের অভ্যন্তরে সিরাজকে হত্যা করে। ইংরেজরা এই হত্যাকাণ্ড জানতেও পারেনি। মিরন যাকে দিয়ে এই হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন করে তার নাম হল মহম্মদী বেগ। সিরাজের পিতা এই মহম্মদী বেগকে পালন করেন এবং সিরাজের মাতা তার বিবাহ দেন। সিরাজ জীবনরক্ষার জন্য কাতর আবেদন করেন এবং তিনি কারও ক্ষতি না-করে অজ্ঞাত স্থানে বাকি দিনগুলি কাটিয়ে দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি

BanglaBook.org

দেন। তাঁর এই কাতর প্রার্থনার উত্তরে তাঁকে কোনো সময় না-দিয়ে হত্যা করা হয়। সিরাজ শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগে চীৎকার করে বলেন:

> I am being killed in retribution for my unjust murder of Husain Quli khan.

৩ জুলাই সকালে মৃত সিরাজের দেহকে হাতির পিঠে চাপিয়ে রাজধানী মুর্শিদাবাদ শহরের রাস্তায় ঘোরানো হয়। সাধারণ মানুষ দেখে আঁতকে ওঠেন। হাতিটি কয়েক মিনিট সেইস্থানে থেমে রইল যেখানে তিন বছর আগে সিরাজ হোসেন কুলি খাঁকে হত্যা করেছিলেন এবং সিরাজের দেহ থেকে কয়েক ফোঁটা রক্ত ঝরে পড়ল। সিরাজের মাতা ক্রন্দনরত অবস্থায় পর্দা ভেঙে তাঁর প্রিয়তম পুত্রের মৃতদেহ দেখতে রাস্তায় চলে আসেন। রাজার কন্যা, গভর্নরের স্ত্রী ও আর এক রাজার মা সেই মহিলাকে খাদিম হোসেনের পশুবৎ আচরণকারী লোকেরা আঘাত করে বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়। এই খাদিম হোসেনকে আলিবর্দি সস্নেহে লালন করেন। এই ঘটনা সম্পর্কে স্যার যদুনাথ সরকার মন্তব্য করেন:

> And Khadim Husain had been cherished in youth by Alivardi. His gratitude to his benefactor only paralleled that of Mir Jafar.

তারপর মিরন সিরাজের ভাই মীর্জা মাহদীকে হত্যা করে এবং সিরাজের মৃত ভাই আক্রাম উদ্‌দৌলার পুত্র মুরাদ উদ্‌দৌলাকেও মিরন হত্যা করে। আলিবর্দির পুরুষ বংশধরদের সবাইকে হত্যা করা হয়। এইভাবে মিরজাফরের সিংহাসনে আরোহণকে মসৃণ করা হয়। সিরাজের মৃত্যুর পর বহুবছর তাঁর বিধবা স্ত্রী লুৎফন্নেসা তাঁর স্বামির কবরে প্রতিদিন সন্ধ্যায় আলো জ্বেলে দিতেন যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন। কবি নবীনচন্দ্র সেন তাঁর বিখ্যাত পলাশির যুদ্ধ কাব্যগ্রন্থে যেভাবে ঘটনার বর্ণনা করেছেন তাতে সিরাজ চরিত্রের মহত্ত্বকেই উজ্জ্বল করে তুলে ধরা হয়েছে। স্যার যদুনাথ সরকারের ভাষায়:

> The Bengali poet Nabin Chandra Sen in his master-piece *The Battle of Plassy* has washed away the follies and crimes of Siraj by artfully drawing forth his reader's tears for fallen greatness and blighted youth.
>
> (vide *The History of Bengal*, vol. II)

কবি নবীন চন্দ্র সেন 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যে ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দের ১৫ এপ্রিল প্রকাশিত প্রথম সংস্করণ এবং ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে দশম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। সজনীকান্ত দাস লেখেন: 'নিজে সরকারী কর্মচারী ছিলেন বলিয়া উপরওয়ালা ইংরেজদের চাপে নবীনচন্দ্রকে প্রথম সংস্করণের অনেক পাঠ বদল করিতে হয়।' (দ্র. পলাশির যুদ্ধ, নবীন চন্দ্র সেন প্রণীত, সম্পাদক-সজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, প্রথম সংস্করণ, ১৩৬৬)

BanglaBook.org

মিরজাফর

বাংলা, বিহার ও ওড়িশার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ্‌দৌলার পতনের পর ইংরেজ কোম্পানির সহায়তায় আলিবর্দির ভগ্নীপতি মিরজাফর বাংলার নবাব হন দু-বার—১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে থেকে ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ এবং পুনরায় ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। এই সময়েই ইংরেজদের সামরিক ও বাণিজ্যিক শক্তি বৃদ্ধি পেল। তাদের রাজনৈতিক প্রাধান্য স্থাপনের পথ প্রশস্ত হল। পলাশির যুদ্ধের ফলে নতুন নবাব হয়ে পড়লেন ইংরেজদের ওপর নির্ভরশীল। মিরজাফর নামেমাত্র নবাব রইলেন, ইংরেজরা ছিল প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী। তাই কয়েক বছরের মধ্যেই ইংরেজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হল। মিরজাফরের শেষ দিনগুলি ভালোভাবে কাটেনি। আফিং সেবনে তাঁর আসক্তি জন্মায়। তা ছাড়া কুষ্ঠরোগে তিনি আক্রান্ত হন। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

(*The History of Bengal*, Vol II)

হোসেন কুলি খাঁ

হোসেন কুলি খাঁ ঢাকাতে ঘসেটি বেগমের এজেন্ট ছিলেন। শহবৎজঙ্গ ছিলেন ঘসেটি বেগমের স্বামী। তিনি ঢাকার গভর্নর ছিলেন। ১৭৫৫ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তিনি মারা যান। তিনি রুগ্‌ণ ও প্রশাসনিক দক্ষতা তাঁর ছিল না। তিনি প্রশাসনিক ব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্ব তাঁর স্ত্রী ঘসেটি বেগমের হাতে ছেড়ে দেন। ঘসেটি বেগম তাঁর প্রিয়পাত্র হোসেন কুলি খাঁর সাহায্যে প্রশাসন ব্যবস্থা চালাতেন। সিরাজ হোসেন কুলি খাঁর অর্থ ও ক্ষমতার জন্য ঈর্ষা করতেন। হোসেন কুলি খাঁ তাঁর জীবন নাশ করতে পারে এই আশঙ্কা সিরাজের ছিল। সম্ভবত ১৭৫৪ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে সিরাজ মুর্শিদাবাদের রাস্তায় হোসেন কুলি খাঁকে হত্যা করেন।

নিখিল নাথ রায় মুর্শিদাবাদ কাহিনী গ্রন্থে লেখেন: 'সিরাজ স্বীয় জননীর কলঙ্ক ক্ষালনের জন্য আদর্শ মহিলা মাতামহীর পরামর্শে উত্তেজিত হইয়া, হোসেন কুলী খাঁকে বধ করিতে আদেশ দেন। ঘাতকের তরবারির আঘাতে যখন সিরাজের মৃত্যু হয় সেই সময়ে সিরাজ বলেন, 'আমার কৃতকার্যের ফল যথেষ্ট হইয়াছে, হোসেন কুলি খাঁর মৃত্যুর প্রতিশোধ হইল'। নিখিলনাথ রায় এই ঘটনার উল্লেখ করে মন্তব্য করেন, 'যে-ব্যক্তি নিজ জননীর পবিত্রতাপহারীর হত্যাকেও ভীষণ পাপকার্য বলিয়া মনে করিতে পারে, হায়! দেশীয় ও ইংরেজ ঐতিহাসিক পুঙ্গবগণ, তাহার প্রকৃতিকে নিষ্ঠুর ও শয়তানতুল্য বলিয়া বর্ণনা করিতে তোমাদের বিবেকে কি কিঞ্চিন্মাত্র লাগে নাই?' (পৃ. ১৪৮)

BanglaBook.org

আলিবর্দির তিন কন্যার পরিণতি

আলিবর্দি বড়ো কন্যা ঘসেটি ও ছোটো কন্যা আমিনা মিরনের আদেশে নদীগর্ভে প্রাণ বিসর্জন দেন। মধ্যম কন্যা ময়মানা ছিলেন সৌকতজঙ্গের মাতা। তাঁর স্বামী সৈয়দ আহম্মদ ছিলেন পূর্ণিয়ার নবাব। মিরজাফর পূর্ণিয়া অধিকার করলে তিনি মুর্শিদাবাদে এসে বাস করেছিলেন কিনা, জানা যায় না। (মুর্শিদাবাদ কাহিনি)

সিরাজের স্ত্রী লুৎফুন্নেসা

সিরাজ বন্দি হবার পর লুৎফুন্নেসাকে ঢাকায় নির্বাসিত করা হয়। সিরাজের মৃত্যুর পরে তাঁকে মুর্শিদাবাদে নিয়ে আসা হয়। তখন খোশবাগ-এর সমাধি তত্ত্বাবধানের কাজে নিযুক্ত হন। তাঁর মৃত্যুর পর খোশবাগেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। লুৎফুন্নেসার জীবিতকালেই তাঁর কন্যা উম্মত জহুরার মৃত্যু হয়। লুৎফুন্নেসার মৃতুর পর উম্মত জহুরার চার কন্যা সরীফন্নেসা, অসাম্মতন্নেসা, সাকিনা ও উম্মতুলা মেহেদি বেগম খোশবাগ প্রভৃতির তত্ত্বাবধানের জন্য ওয়ারেন হেস্টিংসের নিকট প্রার্থনা করেছিলেন। লর্ড কর্নওয়ালিশ তাঁদের ওই দায়িত্ব দেন। তাঁদের মৃত্যু হলে, তাঁদের বংশজাতরা খোশবাগের তত্ত্বাবধানের ভার পেয়েছিলেন। ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে সাকিনার বড়ো মেয়ে খয়েরুন্নেসার মেয়ে জীনা বেগম ও তাঁর ছোটো মেয়ে ফতেমার পুত্র মহম্মদ আলি খাঁ এবং উম্মত জায়েনা ও উম্মত কালসুম বেগম নামে ওই বংশীয় আরও দুজন মহিলা খোশবাগের মাতোয়ালী নিযুক্ত হয়েছিলেন। ক্রমে উক্ত বংশীয়গণের হস্ত হতে সরকার সে ভার গ্রহণ করেন। এইসব তথ্য নিখিলনাথ রায়ের গ্রন্থে আছে। (মুর্শিদাবাদ কাহিনি)

সিরাজের হত্যার জন্য কি ইংরেজরা দায়ী ?

স্যার যদুনাথ সরকার লিখেছেন, সিরাজের হত্যা সম্বন্ধে মিরজাফর কিছুই জানতেন না। ইংরেজরাও এই হত্যাকাণ্ড জানতে পারেনি। নিখিলনাথ রায় লেখেন, 'মুতাক্ষরীনকার বলেন যে, সিরাজের হত্যা সম্বন্ধে মিরজাফর কিছুই জানিতেন না; কিন্তু রিয়াজুস সালতীনকার উল্লেখ করিয়াছেন যে, জগৎ শেঠ ও ইংরেজ সর্দার সিরাজের হত্যাকাণ্ডের জন্য মিরজাফরকে পরামর্শ দিয়েছিলেন। কোন বিবরণ সত্য, তাহা আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি না।' (পৃষ্ঠা ১৪৯)।

মিরন তার পিতার সিংহাসন নিরাপদ করার জন্য হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত করলেও, তার পক্ষে বেশিদিন রাজত্ব ভোগ করা সম্ভব হয়নি। বজ্রাঘাতে তাঁর মৃত্যু হয়। (দ্র. পলাশীর যুদ্ধ, পরিশিষ্ট)

BanglaBook.org

বাংলায় ব্রিটিশ রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রকৃতি

১. ইংলিশ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রথমে একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ছিল। ১৬৯৮ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানি কলকাতায় জমিদারি লাভ করার পর জমিদার হিসেবে রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক হয়। প্রথম থেকেই ইংরেজ বণিকদের লক্ষ্য ছিল মুনাফা অর্জন করা এবং তারা ভারতীয়দের টাকাতেই ভারতীয়দের দেশজয়ের জন্য বদ্ধপরিকর ছিল। সুতরাং রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করতে পারলে রাজস্বেও অধিকার অর্জন করা সম্ভব হবে। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জুন পলাশির যুদ্ধে জয়ী হওয়ার পর ক্রমশ ইংরেজ কোম্পানির রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট শাহ আলম ক্লাইভকে ফরমানের মাধ্যমে বাংলা, বিহার ও ওড়িশার যে দেওয়ানি দেন তার ফলে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানিকে চিরস্থায়ী ভাবে এই পদে নিযুক্ত করা হয়। দেওয়ানের কাজকর্ম শুধু রাজস্ব সংগ্রহ করা ছিল না। সুবার প্রতিরক্ষা এবং আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বও ইংরেজ কোম্পানিকে দেওয়া হয়। বাংলার রাজস্বের ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ করাই ছিল ক্লাইভের উদ্দেশ্য। তারপর থেকে বাংলার রাজস্ব শুধু কোম্পানির বাণিজ্যের প্রয়োজনে নয়, বাংলার রাজস্ব ভারতের অন্যত্র যুদ্ধে ব্যয়নির্বাহের জন্য, কোম্পানির প্রশাসনের খরচের জন্য, চীন দেশে ব্যাবসার জন্য ও বিদেশে যুদ্ধ করবার জন্য ব্যবহার করা হত।

১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে ক্লাইভ দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করে অন্যান্য ইউরোপীয় কোম্পানিকে শান্ত রাখার নীতি অনুসরণ করেন। ইংরেজ কোম্পানি বাংলায় ক্ষমতার প্রকৃত অধিকারী হয়েছে, স্পষ্ট দেখতে পেলে ফরাসি, ওলন্দাজ প্রভৃতি কোম্পানি ঈর্ষান্বিত হয়ে ইংরেজদের রাজনৈতিক প্রতিপত্তি খর্ব করতে তৎপর হত। তাই ক্লাইভ ভারতের আইনসংগত অধিপতি মুঘল সম্রাটের নামকে আবরণরূপে ব্যবহার করেন। শাহ আলমের ফরমানের ফলে বাংলায় দ্বৈতশাসনের প্রতিষ্ঠা হল। ইংরেজ কোম্পানি রইল দেওয়ানরূপে, আর নাজিম সুবাদাররূপে রইলেন নবাব। কিন্তু ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে নবাব নাজমউদ্‌দৌলার সঙ্গে ইংরেজ কোম্পানির যে চুক্তি হল তাতে নবাব প্রশাসনের ও সৈন্যবাহিনীর ওপর নিজের কর্তৃত্ব ত্যাগ করেন, কোম্পানির একজন বৃত্তিভোগী হন। সুতরাং ইংরেজরা নাজিম ও দেওয়ান উভয় ক্ষমতার অধিকারী হয়। তারাই হল বাংলার প্রকৃত শাসক। কিন্তু ক্লাইভ প্রত্যক্ষভাবে প্রশাসনের দায়িত্ব গ্রহণ না-করে একটি 'মুখোশে ঢাকা শাসনব্যবস্থা' (Masked System) প্রবর্তন করেন। কোম্পানি দেওয়ানি ও নিজামত বিভাগের সকল দায়িত্ব অর্পণ করে বাংলায় মহম্মদ রেজা খাঁর ওপর,

BanglaBook.org

আর বিহারে সিতাব রায়ের ওপর। তাঁদের রাজস্ব সংগ্রহ, দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিচার, সাধারণ প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করতে হত। তাঁরা দুজনে ছিলেন কোম্পানির মনোনীত ব্যক্তি; তাঁদের কোম্পানির স্বার্থ রক্ষা করতে ও আদেশ পালন করতে হত। নিজামত বিভাগে নবাবের ক্ষমতা ছিল নামেমাত্র। আসল ক্ষমতা ছিল ইংরেজদের। এই ব্যবস্থাকে প্রকৃত অর্থে দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা বলা যায় না। নবাব ইংরেজের সমকক্ষ ছিলেন না। তিনি তাদের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন। এই ব্যবস্থার ফলে ক্ষমতা ও দায়িত্বের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হল। ইংরেজরা ছিল সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী অথচ তারা সুশাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করেনি। ক্লাইভের পর গভর্নর হলেন ভেরেলস্ট (১৭৬৭-১৭৬৯) ও কার্টিয়ার (১৭৬৯-১৭৭২) । তাঁদের আমলে কার্যক্ষেত্রে দ্বৈতশাসন ব্যবস্থার প্রয়োগ দেখা গেল। প্রজাদের শোষণ করে রাজস্ব আদায় করা হত, কোথাও সুবিচার পাওয়ার উপায় ছিল না। এই অবস্থায় দেশে ভয়ানক বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে দুর্ভিক্ষ হল। দ্বৈত শাসনব্যবস্থার ব্যর্থতা প্রমাণিত হল। এই অবস্থার অবসান ঘটল। ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ কোম্পানি প্রত্যক্ষভাবে দেওয়ানি কার্যভার গ্রহণ করল। (vide Anil Chandra Banerjee, *The Agrarian System of Bengal,* Vol. I: 1582-1793, Calcutta 1980)

২. ওয়ারেন হেস্টিংস (১৭৭২-১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দ)-এর দায়িত্ব গ্রহণ

১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে হেস্টিংস বাংলার গভর্নর নিযুক্ত হন। ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি গভর্নর জেনারেল হন। ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। দ্বৈতশাসন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার নির্দেশ নিয়েই হেস্টিংস কলকাতায় এলেন। নবাবের রাজকোষ মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় স্থানান্তরিত হল, তখন থেকে কলকাতা হল বাংলার রাজধানী। হেস্টিংসকে কোর্ট অব ডিরেক্টরসদের নির্দেশে চলতে হত। তা ছাড়া কলকাতায় যে কাউন্সিল ছিল তার সদস্যদের সঙ্গে পরামর্শ করে শাসনকার্য চালাতে হত। ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে প্রথম কলকাতায় একটি সুপ্রিমকোর্ট স্থাপিত হয়। ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে পার্লামেন্টে গৃহীত পিটের ইন্ডিয়া আইনে (Pitt's India Act) বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির ওপর গভর্নর জেনারেলের কর্তৃত্ব বৃদ্ধি করা হয়।

হেস্টিংস প্রতিটি জেলায় একটি দেওয়ানি আদালত ও একটি ফৌজদারি আদালত স্থাপন করেন। দেওয়ানি আদালতে সভাপতিত্ব করতেন ইংরেজ কালেক্টর, আর ফৌজদারি আদালতে মুসলমান বিচারক ইসলামি আইন অনুযায়ী দণ্ড দিতেন। অবশ্য মুসলমান বিচারকের ওপর নজর রাখবার জন্য কালেক্টর উপস্থিত থাকতেন। জেলা আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপিল করার ব্যবস্থা ছিল।

BanglaBook.org

কলকাতায় অবস্থিত ছিল সদর দেওয়ানি আদালত, আর মুর্শিদাবাদে অবস্থিত ছিল সদর নিজামত আদালত। হেস্টিংস এই দেশের শাসনব্যবস্থায় কোম্পানির কর্তৃত্ব সুদৃঢ় করেন এবং তার মাধ্যমে ইংল্যান্ডের সার্বভৌম অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে দেওয়ানি লাভের পর কোম্পানি ভূমিব্যবস্থা সম্বন্ধে যেসব পরিবর্তন সাধন করেন তাতে সাধারণ মানুষের দুরবস্থা বৃদ্ধি পায়। মুর্শিদাবাদ কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট Richard Becher গর্ভনর Verelst-কে ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দের ২৪ মে, ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দেশের অবস্থা সম্পর্কে যে রিপোর্ট পাঠান তাতে বলেন: Since the accession to the Dewani the condition of the people of this country has been worse than before...This fine country, which flourished under the most despotic and arbitrary Government, is urging towards its ruin, while the English have really so great a share in the administration. (Vide Report of the Land Revenue Commission Bengal, Vol. II, Bengal Government Press, Alipore, Bengal 1940, pp. 189-190)

হেস্টিংস প্রবর্তিত পাঁচশালা ব্যবস্থাতেও (১৭৭২-১৭৭৭) দুর্নীতি বৃদ্ধি পায় ও প্রজাদের কষ্টের সীমা রইল না। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশির যুদ্ধে জয়লাভের পর থেকেই ইংরেজ কোম্পানি ভূমিরাজস্ব থেকে আয় বৃদ্ধির চেষ্টা করে। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে কর্নওয়ালিশ কর্তৃক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন পর্যন্ত কেবলমাত্র বাংলাতেই ইংরেজ কোম্পানি অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে। যতটা বেশি ভূমিরাজস্ব আদায় করা যায় তার জন্য কোম্পানি সবসময়ে তৎপর ছিল। (Ibid; A.C. Banerjee, op. cit.)

৩. লর্ড কর্নওয়ালিশ গর্ভনর জেনারেল নিযুক্ত হন (১৭৮৬-১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দ ও জুলাই-অক্টোবর ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দ)

১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে গৃহীত এক আইনে গভর্নর জেনারেলকে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কাউন্সিলের অধিকাংশ সদস্যদের অভিমত অগ্রাহ্য করবার অধিকার দেওয়া হয়। কর্নওয়ালিশ ব্রিটিশ সংবিধান থেকে গৃহীত মূলনীতির সাহায্যে বাংলার শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলেন। 'আইন সংক্রান্ত, প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা বণ্টনকে বাংলার শাসনব্যবস্থার নতুন সংগঠনের ভিত্তি করা হল।' তাতে শাসনব্যবস্থা অনেকটা কেন্দ্রীভূত হল। কর্নওয়ালিশ বিচার বিভাগের সংস্কার করেন। কালেক্টরকে বিচারকের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হল। কালেক্টর প্রশাসনিক দায়দায়িত্ব পালন করবেন। দেওয়ানি আদালতের ভার জেলাজজকে

BanglaBook.org

দেওয়া হল। তিনটি নগর আদালত এবং ২৩টি জেলা আদালত স্থাপন করা হল। প্রত্যেকটির অধ্যক্ষ হলেন একজন ইংরেজ বিচারক। ছোটোখাটো দেওয়ানি মামলার বিচারের ভার ভারতীয় মুনসেফের ওপর দেওয়া হল। কলকাতা, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ ও পাটনায় চারটি প্রাদেশিক আদালত স্থাপন করা হল। সদর দেওয়ানি আদালত গঠিত হল গভর্নর জেনারেল ও তাঁর কাউন্সিলের সদস্যদের নিয়ে। এই আদালত থেকে লন্ডনে প্রিভি কাউন্সিলে আপিল করা যেত। কর্নওয়ালিশ নবাবকে ফৌজদারি আদালতের বিচার থেকে বঞ্চিত করেন। সদর নিজামত আদালত মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হল। গভর্নর জেনারেল ও তাঁর কাউন্সিলার সদস্যরা এই আদালতের বিচারকের আসনে বসলেন। অবশ্য কাজী ও মুফতিদের সাহায্য নেওয়া হত। কর্নওয়ালিশের আমলে নতুন পুলিশ ব্যবস্থার ভিত্তিও স্থাপিত হল। (A. C. Banerjee, op. cit)

৪. ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দের দুর্ভিক্ষ

১৭৬৯-১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হল তা ইংরেজ কোম্পানির শাসনব্যবস্থা ও ভূমিরাজস্ব নীতিরই পরিণতি। হেস্টিংস স্বীকার করেন এই দুর্ভিক্ষের ফলে বাংলার এক তৃতীয়াংশ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস থেকেই দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শুরু হয়। ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে দ্রুতগতিতে এই দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে পড়ে। বাংলার যে জেলাগুলি সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তা হল, পূর্ণিয়া, ভাগলপুর, রাজমহল, বীরভূম, পাসেট, বর্ধমান, হুগলি, নদিয়া, রাজশাহী, মালদহ, যশোহর, ২৪ পরগনা, মেদিনীপুর, রংপুর, পশ্চিম দিনাজপুরের কয়েকটি অংশ এবং ঢাকার কিছু অংশ। বাখরগঞ্জ, সিলেট, চট্টগ্রাম ও কোচবিহার জেলাসমূহ এই দুর্ভিক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। এই দুর্ভিক্ষ বাংলায় 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে উল্লেখিত। কী ভয়ানক অবস্থা হয়েছিল তা ইংরেজ কোম্পানির উচ্চপদস্থ ব্যক্তি স্যার জন শোর এই দুর্ভিক্ষের আতঙ্ককর পরিস্থিতি একটি কবিতায় ব্যক্ত করেছেন। আমি সেই কবিতাটি উদ্ধৃত করছি:

Still fresh in memory's eye the scene I view;
The shrivelled limbs, sunk eyes, and lifeless hue;
Cries of despair and agonizing groans,
In wild confusion dead and dying lie;
Hark to the jackal's yell and vulture's cry,
The dog's fell howl, as, midst the glare of day,
They riot unmolested on their prey;
Dire scenes of horror, which no pen can trace,
Nor rolling years from memory's page efface.

(vide Report of the Land Revenue Commission Bengal, vol. II. p. 192)

BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

ইংরেজ কোম্পানির কর্মচারীরা বিবেকবর্জিত হয়ে বাণিজ্যিক কাজে মুনাফা করত—তার সমর্থনে অনেক তথ্যই পাওয়া যায়। কোর্ট অব ডিরেক্টরস একটি নোটে স্বীকার করে:

> That the Ryots were compelled to sell their rice to monopolising Europeans who could be no more than persons of rank in our service.' (Ibid)

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় *আনন্দমঠ* (১৮৮২) ও *দেবী চৌধুরানি* (১৮৮৪) উপন্যাসে বাংলার অর্থনৈতিক দুরবস্থার যে করুণ চিত্র অঙ্কিত করেছেন তাতে পলাশির যুদ্ধের পরে ও ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময়কালের পরিস্থিতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করা যায়। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর সম্পর্কে তথ্যসমৃদ্ধ গবেষণামূলক আলোচনা পাওয়া যায় অধ্যাপক নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ লিখিত *The Economic History of Bengal: from Plassey to the Permanent Settlement*, vol. II, Calcutta 1962 গ্রন্থে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর সম্বন্ধে আলোচনা অব্যাহত থাকে। ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে অধ্যাপক অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত *The Agrarian System of Bengal*, vo. I: 1582-1793 গ্রন্থেও এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যায়।

পলাশির যুদ্ধের পর ভারতের অর্থনীতিতে আমূল পরিবর্তন ঘটে। ভারত থেকে ইংল্যান্ড ও অন্যান্য পশ্চিম ইউরোপের দেশসমূহে সম্পদ স্থানান্তরিত হয়। তাকে অর্থনীতিবিদরা 'পলাশির লুণ্ঠন' (Plassey Plunder) বলে উল্লেখ করেন। তাকে সম্পদের নিঃসরণ (Drain of Wealth) বলেও উল্লেখ করা হয়। বাংলায় রাজনৈতিক কর্তৃত্ব লাভের পর ইংরেজরা নানাভাবে বাংলার সম্পদ লুণ্ঠন করে।

(N. K. Sinha, *Economic History of Bengal*, 3 vols.)